সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র

তাসলিমা নাসরিন
রেজিস্ট্রেশন নং : ০৬
শিক্ষা বর্ষ : ২০০৮-২০০৯
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০১৪

<u>প্রত্যয়নপত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তাসলিমা নাসরিন কর্তৃক উপস্থাপিত **‘সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এ অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

আহমদ কবির
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		৪-৫
প্রথম অধ্যায়	: ভূমিকা	৬-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গ্রামজীবনের রূপায়ণ	২৭-৪৬
তৃতীয় অধ্যায়	: সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র	৪৭-৯৬
চতুর্থ অধ্যায়	: সার্বিক মূল্যায়ন	৯৭-১০৪
গ্রন্থপঞ্জি		১০৫-১০৬

মুখবন্ধ

'সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র' আমার এম. ফিল অভিসন্দর্ভ। এতে চারটি অধ্যায়ের শিরোনামে নির্ধারিত বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের ভূমিকার পরে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য কিছু ছোটগল্পের আলোচনা করা হয়েছে। এর পরেই সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছোটগল্পে গ্রাম জীবনের বিশ্লেষণ। এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের পটভূমিতে রচিত প্রায় অধিকাংশ গল্পই আলোচিত ও বিশ্লেষিত। অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে দু'টির জীবনচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে সমগ্র অভিসন্দর্ভটি।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল গবেষক হিসেবে 'সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র' শীর্ষক গবেষণাকর্ম শুরু করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আহমদ কবিরের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে এ অভিসন্দর্ভ। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অভিমত, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। এ গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমার সহপাঠী, বন্ধু ও বর্তমানে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাশরিক-ই-হাবিবের কাছেও আমি ঋণী। তাঁর পরামর্শ নানাভাবে আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজ করেছে। এ অভিসন্দর্ভ রচনাকালে বিভিন্নভাবে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব সোহানা মাহবুব ও জনাব মোমেনুর রসুলের নাম উল্লেখযোগ্য। এ গবেষণাকর্মে আমি মূলত ব্যক্তিগত সংগ্রহের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ কাজে গ্রন্থাগারসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে, এ অভিসন্দর্ভ রচনাটি যার অনুপ্রেরণা ছাড়া প্রায় অসম্ভব ছিল তার কথা স্মরণ করতে চাই, সে আমার স্বামী মোহাম্মদ আল-মামুন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ঊর্ধ্বে। প্রায় পাঁচ বছর এ গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকায় অনেকটা অবহেলা ও যত্ন বঞ্চিত করে রাখতে হয়েছে আমার পুত্র ওমর আল নাওয়াজ ও কন্যা জুনায়রা আল ওয়াছিয়াকে।

আরো একজনের কথা স্মরণ না করলেই নয়, যিনি এ গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবচাইতে বেশি আনন্দিত হবেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এস. এ. এম. আলমগীর। তাঁর প্রতি রইল শ্রদ্ধা।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দেশ-কাল-সমাজকে ঘিরে মানবজীবনের যে অবিরাম চলমান প্রক্রিয়া, একজন সচেতন সাহিত্যিকের লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে তা সবসময় বিদ্যমান থাকে। শিল্পী মাত্রই তাঁর পারিপার্শ্বিক আবহের পরিচয় ধারণ করেন এবং তার প্রতিফলন ঘটান তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাকর্মে। প্রবহমান সমাজের রূপ ধারণ করেই শিল্পসাহিত্যের বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে। আর এ কারণেই সাহিত্যসৃষ্টির কোনোটিই দেশ-কাল ও সমাজকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

একজন লেখকের লেখক হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া এর পেছনে কাজ করে তাঁর পারিপার্শ্বিক ও পরিচিত পরিবেশ। তাঁর পরিবার, সমাজ আর পরিবেশের ছায়ার রেখাপাতেই তাঁর শিল্পকর্ম বা সাহিত্যকর্ম গড়ে ওঠে। আর তাই সাহিত্যিকের চৈতন্যের এই ক্রিয়াশীল অনুভবকে বোঝার জন্য, সাহিত্যকর্মের আলোচনা ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে দেশ-কাল ও সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

ভারত উপমহাদেশের তথা গোটা বিশ্বের জন্যই বিশ শতকের প্রথমাংশ ছিল এক চরম অস্থিরতা বা অস্থিতিশীলতার সময়। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) ফলে সৃষ্ট স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৯১৮) ব্যাপক ভাঙন ও অবক্ষয়, আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন, ভারতীয় কংগ্রেস (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫) নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) প্রভৃতি সমাজ জীবনে আনে আধুনিক সচেতনতাবোধ। এছাড়া ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ-বিপ্লবে জারের পতন এবং বলশেভিক দলের ক্ষমতা গ্রহণ সমগ্র বিশ্বের মানুষের চিন্তাচেতনা ও অনুভূতির জগতে নতুনভাবে সাড়া জাগায়।

বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশের লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অভিযানকে অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে ৭ আগস্ট ১৯০৫ কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। বিদেশী পণ্য বর্জন এর মূল লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেসের একটা দুর্বলতা ছিল এ আন্দোলনে মুসলমানদের সামিল করতে না পারা। ব্রিটিশ সরকারও সে সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িকতায় ভাঙ্গন সৃষ্টিতে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিল। মূলত এ সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণেই

'মুসলীম লীগের' (১৯০৬) জন্ম হয়। সরকারি দমননীতি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে স্বদেশী আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে এ দেশের জাতীয় সংগ্রামে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যা পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।

বঙ্গভঙ্গ রহিত (১৯১১) হওয়ায় দেশের যুবসমাজ যে ভাবাদর্শ ও কর্মের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রত্যাশায় ছিল তার গতি যেন হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল। দেশের যুবচিত্তে হতাশা ও ক্লান্তির ছায়া দীর্ঘতর হল। রবীন্দ্রনাথের একটি রচনায় সমকালীন বাঙালি জীবনের মানস-সংকটের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে :

> বাংলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বান ডাকিল। আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। ... সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। ... সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।[১]

বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় (১৯১২)। সন্ত্রাসবাদী তরুণ সমাজও তখন কলকাতায় ভিড় জমায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতাশার যন্ত্রণা এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাবে তখন অসহায় হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় জাতীয় জীবন যখন বিপর্যস্ত, যখন যোগ্য নেতৃত্বের প্রবল অভাব, তখন গান্ধীজী জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে আসেন। ইংরেজ সরকারের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দমনের অভিপ্রায়ে যখন রাওলাট আইন (১৯১৯) পাস করে, তখন তার বিক্ষোভও তীব্রতর হয়। গান্ধীজী এ আইনের বিরুদ্ধে হরতালের ডাক দেন। ঠিক এ সময়েই জালিয়ানওয়ালাবাগে শিখ সম্প্রদায়ের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ এর ১৩ এপ্রিল) হয়, যা সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগায়। এর ফলে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিচার, খেলাফত আন্দোলনকারীদের দাবি বাস্তবায়ন এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

এই অহিংস আন্দোলনের অপর নাম সত্যাগ্রহ। কেবল তাই নয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পথও অহিংসার পথ। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল :

> আমি চাই ভারতবাসীর অন্তরে এ প্রত্যয় জাগ্রত হোক যে, ভারতের একটি আত্মা আছে যা ধ্বংস করা যাবে না। এই আত্মা যে কোন রকম দৈহিক দুর্বলতা জয় করতে এবং গোটা বিশ্বের সম্মিলিত দৈহিক শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম।[২]

অসহযোগের ডাকে বিপুল সংখ্যক কর্মহীন শিক্ষিত যুবক ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সাথে যোগ দেয় রাজনীতিতে সাড়া দিতে উৎসাহী স্বেচ্ছায় চাকরী বর্জনকারী, স্কুল কলেজ ত্যাগকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত শ্রেণী। এ আন্দোলনে এরাই ছিল অগ্রগামী এবং প্রাণশক্তির উৎস।

কিন্তু বাস্তবমুখী কর্মসূচির অভাবে অসহযোগ আন্দোলন বিশেষ কোনো আদর্শের অভিব্যক্তি ছড়াতে পারেনি বা কোনো বিকল্প সুস্থ রাজনীতির দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়নি। গান্ধী হঠাৎ সে আন্দোলন থামিয়ে দিলে দেশবাসী তীব্রতর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। কেননা এ আন্দোলনের সম্ভাব্য সফলতা সম্পর্কে মানুষ ছিল প্রবলভাবে আশাবাদী :

> 'আন্দোলন ব্যর্থ হলে তরুণ সমাজের একাংশ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিল। আর তরুণ সাহিত্যিকরা রাজনীতির পথ ছেড়ে একটা রোমান্টিক জগতের আশ্রয় নিল। এই রাজনীতিবিমুখ বুর্জোয়া প্রভাবান্বিত তরুণ সাহিত্যিকরা 'ইয়াং বেঙ্গল' দলের মতো সাহিত্যের মধ্যে পুরনো সামন্তবাদী সংস্কারকে উপড়ে ফেলতে শুরু করল। কিন্তু নতুন সাহিত্যিকদের নতুন আমদানিকৃত ভাবধারা বিশ্বাসযোগ্য জমি পেল না। সেসব ভাবময়তার ভিত্তি ছিল মানসিক, বাস্তব নয়। অর্থাৎ সামন্তনীতিকে বিসর্জন দিলেও তার জায়গায় গড়তে পারল না কোন বুর্জোয়ানীতি অথবা কোন সৃষ্টিময় আশার পথ।'[৩]

পরবর্তীকালে রূপান্তরিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূলেও ছিল প্রবল দেশপ্রেমের বন্যা। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়ে (১৯২০) মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি গান্ধীর চরকানীতি ও অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি এবং তাকে নেতা বলেও মেনে নিতে পারেন নি।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাফত আন্দোলন ও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের একটা যোগসূত্র ছিল। এছাড়া কংগ্রেসের স্বরাজ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাফত আন্দোলন এত বেশি সাড়া জাগায় এবং জনগণকে এত বেশি অনুপ্রাণিত করে যে এতে সরকারও ভীত হয়ে ওঠে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার মানুষেরা ঘরের কাছাকাছি উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এতে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় সমকালীন হিন্দু নেতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি যদিও প্রথম দিকে এর সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থী ছিল হিন্দু। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন মুসলমান সমাজের জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিকাশের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পরিচয় লাভ করে প্রথম থেকেই। এর ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান তরুণেরা আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তিলাভ করে, ঠিক তেমনি প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হওয়ার প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি খুঁজে পায়।

আর এ ধারায় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী ইউরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকার করে ১৯২৬ এ প্রতিষ্ঠা করেন ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ এবং প্রকাশ করেন মুখপত্র ‘শিখা’। ‘শিখা’ পত্রিকায় এ স্মরণীয় বাক্য লেখা থাকত ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হোসেন (১৮১৬-১৮৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল ‘বুদ্ধির মুক্তি’ বা Emancipation of intellect। এই মূলমন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোঁমা রোলা, ইরানি কবি সাদির কাছ থেকে আর হযরত মুহম্মদ (সা:) এর কাছ থেকে। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনায় বাংলার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে তোলার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল সাহিত্য সমাজ।

১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাঙন দেখা যায়। অধিকাংশ হিন্দুর নিকট জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা অভিন্ন রূপ ধারণ করে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বল্পসময়ের জন্য সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিল। লখনৌ চুক্তি, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ মনোভাবের বহি:প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এ সম্প্রীতি খুবই অল্প সময় স্থায়ী ছিল।

হিন্দু মুসলিম বিরোধের কারণ হিসেবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন নীতিকে দায়ী করতে চেয়েছেন। আবার অন্যদিকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ নীতিকেই তাঁদের মূল দাবি হিসেব ধরে রাখতে চেয়েছেন।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের নতুন চেহারা দেখে মুসলমান নেতারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রবল জোর প্রদান করে। কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে এবং সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি ‘স্বরাজ-শাসনতন্ত্র’ প্রণয়নের প্রস্তাব পাস করে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসার স্বার্থে মুসলিম লীগ সিন্ধু পৃথকীকরণ এবং পাঞ্জাব বাংলাদেশ ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের শর্তে যৌথ নির্বাচনের পক্ষে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি পরিত্যাগ করতে রাজি থাকে। ঠিক এই সময়ে আন্তর্জাতিক একটি সমস্যার কারণে ভারতের অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ পড়ে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের ধ্বংস (১৯২৯) ভারতেও বিপর্যয় ডেকে আনে। মূলত এ দেশে রাজনৈতিক সংকট, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ১৯২৯-৩০ সময়কাল ছিল মারাত্মক প্রতিকূল। সমাজ-মানস ছিল চরম অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন।

১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দল পুর্নগঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেও আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়ার চেষ্টা শুরু করেন। এছাড়া মুসলিম লীগও ১৯৩৬ সালে ভারত শাসন আইন সম্পর্কে নিজেদের নীতি নির্ধারণে মনোযোগ দেয়।

'১৯৩৬ সালে এ. কে ফজলুল হক বাংলাদেশে 'কৃষক-প্রজা সমিতি' পুর্নগঠিত করেন এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কর্মসূচি প্রচার করেন। জিন্নাহ ও ফজলুল হকের মধ্যে বিরোধ বাধে। উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।'[৪]

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে (১৯৩৭) কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য, উর্দুর স্থলে হিন্দি ভাষাকে উৎসাহিতকরণ, বন্দে-মাতরমকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মুসলমানরা সক্রিয় প্রতিবাদ করে। ফলত তখন থেকে মুসলিম লীগ গণসংগঠনের রূপ ধারণ করে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের মুখে পতিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ধ্বংস বয়ে আনবে বলে কংগ্রেস মত প্রকাশ করে। এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, এসব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে নিজের শান্তি ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়া ভারতের উচিত।

ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) দু'দিন পর ভারতের ভাইসরয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশের বাস্তবায়ন দ্রুত স্থগিত করে দেন। জনসমর্থন লাভের প্রত্যাশায় নির্বাহী পরিষদে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিতে আগ্রহী হয়ে তিনি গান্ধী ও জিন্নাহকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা উভয়েই এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। কারো পরামর্শ ছাড়াই যুদ্ধ ঘোষণা করে ভাইসরয় ভারতের ক্ষতিসাধন করেছেন বলে কংগ্রেসের ধারণা। এ কারণে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে কেবল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলায় জনগণের সরকার কাজ করতে থাকে। কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা পদত্যাগের সাথে কংগ্রেস শাসন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুক্তি দিবস পালন করে।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চে লাহোরে মুসলীম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর-পূর্ব এর মতো যেসব অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাধিক্য,

যেসব অঞ্চলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবি ছিল। এ. কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। তবে ২৪ মার্চ থেকে তিনি লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। মুসলিম লীগের এ দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেসের মন:পুত ছিল না। ১৯৪১ সালে মাদ্রাজে মুসলিম লীগের মূলনীতিকে পাকিস্তান অর্ন্তভুক্ত করে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব বিষয়ে ফজলুল হক ও জিন্নাহর বিরোধ তীব্রতর হয়। স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জিন্নাহ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একতরফাভাবে ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ফজলুল হক হিন্দু-মুসলমানের সহ অবস্থানের নীতি সমর্থন করতেন। তিনি জিন্নাহের প্রদর্শিত পথকে কল্যাণকর মনে করেননি। তাঁর মতে পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের জন্য একই রকম ফর্মুলা প্রযোজ্য হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য ভারতবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি ধারণা পোষণ করতেন। ইংরেজ সরকার জিন্নাহ ও হককে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে ফজলুল হককে সম্মত করতে সরকার ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে তাঁর কখনও ঐক্য হয়নি।

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেস মানতে পারেনি। এর বিপক্ষে কংগ্রেসের প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। কংগ্রেস নেতাদের ধারণা ছিলো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ভারতের জন্য একটি নিশ্চিত বিপর্যয়। নেহেরু মনে করতেন যে, ধর্ম কখনো 'Nation' এর ভিত্তি হতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের যুক্তি ছিল যে, ভারত একটি দেশ নয় বরং উপমহাদেশ এবং ইউরোপীয় ধারণায় Nation ও Nationality এখানে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল (১৯৩৯-১৯৪৫) এদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবহের জন্য ছিল চরম সংকটের কাল। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণে (১৯৪৫) বিশ্বব্যাপী যে বিনাশ ও বিপর্যয়ের স্পর্শ অনুভূত হয় তার প্রবাহ ভারতের সার্বিক পরিস্থিতিকে আলোড়িত করে। এরই মধ্যে সংঘটিত হয় শতাব্দীর সবচেয়ে বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০) নামে পরিচিত এই দুর্ভিক্ষে এ দেশের অগণিত মানুষ মারা যায়। বিপন্ন হয় মানবতা। ভেঙে পড়ে অর্থনৈতিক কাঠামো। গোটা দেশে হাহাকার। আর দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশের ঠিক পূর্বক্ষণে প্রবল সাম্প্রদায়িক বিরোধ (১৯৪৬) এ দেশের রাজনৈতিক,

সামাজিক সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ধারাকেও বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। ধর্মকে রাজনৈতিক প্রেরণা হিসেবে ব্যবহারের এ উপমহাদেশীয় প্রবণতা সবচেয়ে দুর্বিসহ ও ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে এ সময়ে।

মূলত বিশ শতকের প্রথমার্ধ এ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটের সময়। সমাজ জীবন তখন ছিল সামগ্রিক অর্থে আন্দোলিত ও বিপর্যস্ত, বিচিত্র সব ঘটনার প্রবল প্রবাহ উত্তাল করে রেখেছিল এ সময় পরিসরকে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পাকিস্তান দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী বাঙালি মুসলমানদের উপর উর্দুভাষাকে চাপিয়ে দেয়ার অভিসন্ধি করতে থাকে। বাংলাভাষী অনেক শিক্ষিত মুসলমান বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ সরিয়ে দিয়ে তার স্থলে উর্দু ও আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগের সমর্থন করেন।

পূর্ববাংলা মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল, এখানে শিল্পকারখানা কিছু ছিল না। স্বাধীনতার পরে এ অঞ্চলের উন্নতির জন্য শাসকগোষ্ঠীর কোনো তৎপরতাও ছিল না। ফলে নবসৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থিক দুর্গতি ঘুচল না, এছাড়া কৃষিপণ্য উৎপাদনের ফলে যতখানি সমৃদ্ধি অর্জন হয় তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রাসনের ফলে পূর্বপাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি করে। ঠিক এমন একটি অবস্থায় নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ বুঝতে আরম্ভ করল যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচণ্ড শাসন তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। পশ্চিমা শাসকেরাও তাঁদের মতে পূর্ব পাকিস্তানের কলকাতা ঘেঁষা হিন্দু বাঙালিয়ানা ছাড়াবার জন্য বিভিন্ন তৎপরতা চালাতে আরম্ভ করল। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষায় প্রচলিত করতে চাইল। বাঙালি মুসলমানদের সবদিক দিয়ে শোষণ করার অভিসন্ধিকেও শাসকেরা গোপন করল না। কিছু খাঁটি দেশপ্রেমিক ও ভাষাপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী দৃঢ়ভাবে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে, উর্দু নয় বাংলাই হবে বাঙালি মুসলমানদের একমাত্র ভাষা। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না ফলে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য ছাত্রদের সর্বদলীয় কমিটি একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) সারা

দেশে হরতাল এবং বিক্ষোভ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং প্রস্তাবিত হরতাল যাতে পালিত হতে না পারে সেজন্য সরকার সমস্ত সভা, সমিতি, মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটার সময় সাধারণ স্কুল, কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গাজীউল হকের নেতৃত্বে একটি বিরাট সভায় মিলিত হন। ১৪৪ ধারার ভঙ্গ করে মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছালে ছাত্রদের বাধা দেয় পুলিশ। ফলে সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। বাংলা ভাষার জন্য নিহত হয় সালাম, বরকত, রফিকের মত তরুণ প্রাণ। বহু সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও রক্তের বিনিময়ে বাঙালি আবার তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সম্মান রক্ষার্থে সাফল্য অর্জন করে।

একুশের আন্দোলনের প্রভাব এমন ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল যে, ১৯৫২ সালের এ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। পশ্চিমের শাসকেরা এক রকম বাধ্য হয়েই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়। তারা ভেতরে ভেতরে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বিকাশকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা চালাতে থাকে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহারকে চাপিয়ে রাখা হয়। বেতার থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করা হল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বই-পত্র আনাও এক প্রকার বন্ধ করা হল। এমন পরিস্থিতিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে বাংলার উন্নয়নের জন্য কিছু ভালো কাজের চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ১৯৫৭ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি করেও পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই আন্দোলন দমন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের বার বার জেলে দেয়া হচ্ছিল। এর কারণেও সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে শাসন ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরে এদেশের সাধারণ জনগণও সোচ্চার হলেন। কিন্তু সবেচেয়ে অবিচার এবং সর্বাপেক্ষা চরম নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। তখন পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা সরকার গঠন করতে দেননি। একাত্তরের ২৫ শে মার্চের

কাল রাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তারপর নয়মাস দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। জন্ম হয় লাল-সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ।

একটি নবসৃষ্ট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া এক মহত্তম প্রাপ্তি। কিন্তু এ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের শোষণ ও দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের আর্থ উৎপাদন কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক উত্তেজনা, অস্থিরতা, রাজনৈতিক মতবিরোধ ও উপদলীয় সংঘাত। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। এই বছরের ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগরে নির্মমভাবে হত্যা করা মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মুজিব নগর সরকারের নেতৃস্থানীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী এবং মোঃ কামরুজ্জামানকে। জাতীয় রাজনীতির এই চরম পরিস্থিতিতে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন তিনি। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের এই দীর্ঘ উপস্থিতি বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে করে তুলেছিল প্রাণশক্তিহীন।

১৯৪৭-১৯৫৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা তাঁদের জাতীয় চৈতন্যের মর্মমূল থেকে উৎসারিত ঘটনা ও সত্যেরই রূপরেখা চিত্রিত করেছেন। সামরিক শাসন প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে এদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাদের শাসন ও শোষণকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বি. এন. আর, প্রেসট্রাষ্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে আদমজি, দাউদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং

উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানাভাবে শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করায় সামরিক সরকার সাফল্য অর্জন করে। ফলে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ সাহিত্যিকই-

> 'জীবনবোধের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। পরিবর্তন ঘটলো মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের। তাঁরা জীবিকার উন্নতির ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাহিত্যভাবনা ও শিল্পশরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলে ফ্রয়েডে আশ্রয়ী, কেউ- বা স্বল্পভাষী, কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। মানবতাবাদীশ্রেণী অংশত আক্রান্ত হলেন, কারণ অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা ততোধিক নিরাপদ। এঁদের অধিকাংশই হলেন আত্মরোমন্থনে তুষ্ট, কল্পলোকের জ্বলন্ত জতুগৃহে যন্ত্রণাবিদ্ধ, ক্রমবিকাশে শঙ্কাগ্রস্ত, দেহবাদী পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।'[৫]

ঠিক এমনই এক সময়ে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দুরবস্থায়, এদেশের গ্রামজীবন যখন বিপর্যস্ত তখন দারিদ্র্যপীড়িত ও নির্যাতিত গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে আবির্ভাব ঘটে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬)।

> 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় শক্তিমান ভূমিনির্ভর সামন্তশক্তির নিপীড়নে জর্জরিত গ্রামের বিত্তহীন সাধারণ মানুষের দুঃখময় জীবন জয়েনউদ্‌দীনের গল্পের উপজীব্য।.... তৃণমূল- আশ্রয়ী জনসাধারণ তাদের প্রচলিত জীবনাচরণ, আচার, অভ্যাস, রুচি এবং কথ্যভাষা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে গল্পগুলোতে।'[৬]

সরদার জয়েনউদ্‌দীন ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁর বাল্যকাল ও শৈশব কেটেছে গ্রামের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবেশকে লালন করে। গ্রামের খুঁটিনাটি আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। এছাড়া বিভাগপরবতী ও পূর্ববর্তী দেশের নানা সংকট, অভ্যন্তরীণ সমস্যা, জটিলতা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন যা তাঁর কথাসাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁর জীবন-কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহমদ কবির বলেন :

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। উনিশ শ’ সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যে নতুন ভুবনের নির্মাণ হচ্ছিল, সরদার জয়েনউদ্‌দীন সেই ভুবনের অন্যতম রুপকার। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুব-উল-আলম, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, আবু রুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখের রচনা দিয়ে তখন বাংলাদেশী কথাসাহিত্যের ভিত স্থাপিত হচ্ছিল। এঁদের সঙ্গে পরে যারা এসে যুক্ত হলেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁদেরই একজন। পঞ্চাশের দশকে ছোট গল্প রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হতে থাকে, পরে উপন্যাসেও তিনি খ্যাতিমান হন। সমাজের নিম্নকোটি মানুষের জন্য তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম এবং সেজন্য তাদের দু:খ বেদনা তিনি গভীর মমতা ও আন্তরিকতায় তুলে ধরতে পেরেছেন। বহমান সময়ের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত ও আলোড়ন তাঁর রচনা কর্মের বিষয় হয়েছে। সন্দেহ নেই সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সাহিত্যসৃষ্টি বাংলাদেশের গল্প উপন্যাসের জগৎ সমৃদ্ধ করেছে।[৭]

সরদার জয়েনউদ্‌দীন জন্ম হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের চরখাঁপুর গ্রামে। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ জয়েনউদ্‌দীন বিশ্বাস। ‘বিশ্বাস’ ছিল সরদার জয়েনউদ্‌দীনের পারিবারিক পদবী। তাঁর মায়ের নাম সখিনা খাতুন, পিতা তাহেরউদ্‌দীন বিশ্বাস। তাহেরউদ্‌দীন বিশ্বাসের পিতা অর্থাৎ সরদার জয়েনউদ্‌দীনের পিতামহ ছিলেন ঘেরানি বিশ্বাস, একজন ছোটখাট জোতদার।

গ্রামে সরদার জয়েনউদ্‌দীনদের পরিবারের বেশ মর্যাদা ছিল। কৃষি কাজ ছিল তাঁদের পরিবারের প্রধান আর্থিক ভিত্তি। ঘেরানি সরদারের সময়ে পারিবারিক এ মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে পরিবার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতায় ভরে ছিল। ঘেরানি সরদার ছিলেন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। ফলে অনেক জমিজমা করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে পদ্মার ভাঙনে তাঁদের প্রচুর জমিজমা বিলীন হয়ে যায়। ফলে তাহেরউদ্‌দীন বিশ্বাসের সময়ে সংসারের ছিল পড়তি অবস্থা । পিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন, তিনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আর বিরাশি বছর বয়সে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এছাড়া খুব ধর্মপ্রাণ মুসল্লী ছিলেন

তিনি । সাত বছর বয়স থেকে কোনোদিন তাঁর নামাজ কাজা হয়নি। ইসলামী রীতিনীতি তিনি খুব ভালো করে মানতেন এবং বেশরিয়তী কোনো কাজে তিনি যেতেন না।

বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রামীণ মুসলমান পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী তাহেরউদ্‌দীন বিশ্বাস ও তাঁর ছোট ছেলে জয়েনউদ্‌দীনকে স্থানীয় মাদ্রাসাতে ভর্তি করিয়েছিলেন। ফলে ছোট ছেলে জয়েনউদ্‌দীনের লেখাপড়ার সূত্রপাত ঘটে আরবি শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু ছয়মাস কি এক বৎসর তিনি মাদ্রাসাতে ছিলেন, তারপর তিনি উদয়পুর মিডল ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্তি হন। তিনি স্কুলে ভাল ছাত্র হিসেবে ১৯৩২ খিস্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চার টাকা সরকারি বৃত্তি পান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন । পরে পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে আই, এতে ভর্তি হন। পড়ালেখার ফাঁকে জুট রেগুলেশনে অস্থায়ী এক চাকরি করেন। কিন্তু তিনি ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন না। এরপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। অবস্থার শিকার হয়ে পড়ালেখা তিনি আর করলেন না। চাকরি খুঁজতে খুঁজতে সেনাবাহিনীতে একটা চাকরি পেয়ে যান তিনি।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বিয়ে করে সংসার জীবন আরম্ভ করেন ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাঁর স্ত্রীর নাম রাবেয়া খাতুন। নতুন স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে সামরিক ব্যারাকে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখের। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সুন্দর বোঝাপড়া ছিল। স্ত্রী রাবেয়া খাতুন তেমন লেখাপড়া জানতেন না, আধুনিক ছিলেন না। তথাপি গ্রামীন মূল্যবোধসম্পন্ন এই মহিলা সুন্দরভাবে তাঁর সংসার গুছিয়ে নিয়েছিলেন। স্বামীর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। সরদার জয়েনউদ্‌দীন ও রাবেয়া খাতুনের দুই ছেলে তিন মেয়ে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর সরদার জয়েনউদ্‌দীন নিজের দেশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। সেনাবাহিনী থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি প্রথমে শ্লেটের ব্যবসা আরম্ভ করেন, কাপড় সেলাইয়ের দোকান দিলেন, পরে সেনা ছাউনিতে মাল সরবরাহের ঠিকাদারিতে তালিকাভুক্ত হলেন কিন্তু কোনো কাজেই সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি চাকরি পেয়ে যান দৈনিক পাকিস্তান অবজারর্ভার পত্রিকায়। সরদার জয়েনউদ্‌দীন কর্মজীবনের একটি

উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর সাংবাদিক জীবন। আর এ সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় চাকরির সূত্রে। অবজারর্ভারে তিনি বিজ্ঞাপন সহকারী হিসেবে ১৯৫১ সন পর্যন্ত কাজ করেন। ঐ বছরেই তিনি বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার হিসেবে দৈনিক সংবাদ এ যোগ দেন। এক স্মৃতিকথায় তিনি জানিয়েছেন-

> 'আমি আমার যৌবন-জীবনের সুন্দর দিনগুলো দৈনিক সংবাদ এর বর্তমান ঠিকানায় এই অফিসের ছোট কামরাগুলোর মধ্যে কাজে নিমগ্ন থেকে কাটিয়েছি।' (সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী, সংবাদ ১৭ই মে ১৯৮০) [৮]

তিনি অন্যত্র বলেছেন-

> 'সংবাদের জন্মকথা মনে হতেই চোখে ভাসছে কাঁচা পাকা দাড়ির বুড়ো শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী নিশাত সিনেমা হল মুখো হয়ে সংবাদ অফিসের ছোট বারান্দায় বসে দু'হাত তুলে মোনাজাত করছেন সংবাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে। আমরা তাঁকে ঘেরাও করে দাড়িয়ে আছি। (সংবাদ জীবনের কথা-সংবাদ, 'পচিঁশ বছর পূর্তি সংখ্যা', ১৯৭৬) [৯]

১৯৫৫ সালে নতুন চাকরির প্রস্তাব আসেন আলতাফ গহরের কাছ থেকে। আলতাফ গহর ছিলেন তখন স্বরাষ্ট্র সচিব। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের মাধ্যমে আলতাফ গহরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আলতাফ গহরই তাঁকে জানায় পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি দু'টি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চায় এবং এ পত্রিকার ভার সরদার জয়েনউদ্‌দীনকে নিতে হবে। পত্রিকা দু'টির নাম 'সেতারা' ও 'শাহীন'। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের মতো যোগ্য লোকের সম্পাদনার গুণে পত্রিকা দু'টির প্রচারও বেড়ে গেল। সরদার জয়েনউদ্‌দীন চিন্তা চেতনায় প্রগতিশীল, এর ফলে কর্তা ব্যক্তিরা নাখোশ হতে আরম্ভ করে। কিছু দিনের মধ্যেই পত্রিকা দুটো বন্ধ করে দিলেন এম. এন. খান। ফলে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের চাকরি চলে গেল।

১৯৫৬ সালে 'সেতারা' ও 'শাহীন' থেকে অব্যহতি পাওয়ার পরবর্তী চার পাঁচ বৎসর তিনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। ১৯৫৬ সনে তাঁর বন্ধু আবদুল গণি হাজারী 'দি রিপাবলিক' নামে একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজি সাময়িকী বের করেন। সরদার জয়েনউদ্‌দীন ছিলেন 'দি রিপাবলিকের' পরিচালক, প্রকাশক ও মুদ্রক । তিনি ১৯৫৮ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যনেজার হন। ১৯৫৯ সালে অল্প সময়ের জন্য 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। ঐ বছরই তিনি ‘তিতাস বুকস’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি যখন সংবাদপত্রের এ চাকরিগুলো করছিলেন তখন তাঁর উপার্জনে সংসার প্রায় চলছিল না। পরিবারের স্বচ্ছলতা আনার জন্য তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইস্টার্ণ ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে যোগ দেন। এতে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে এলেও লেখালেখিটা হয়ে উঠছিল না। উল্লিখিত হয় যে, ‘সমকাল’ সম্পাদক সিকান্‌দার আবু জাফর সরদার জয়েনউদ্‌দীনকে বীমার কাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি আশঙ্কা করেন পয়সা হলে লেখক হিসেবে জয়েনউদ্‌দীনের অস্তিত্বই থাকবে না। তারপর সিকানদার আবু জাফরই নিজে উদ্যোগী হয়ে বাংলা একাডেমীতে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেন। বাংলা একাডেমীতে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের পদ ছিল সহকারী অফিসার, প্রকাশনা ও বিক্রয় শাখা। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা একাডেমিতে ছিলেন তিনি ।

এরপর ইউনেস্কো ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ন্যাশনাল বুক সেন্টারে ঢাকা অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে তিনি যোগদান করেন। এ চাকরিটি ছিল তাঁর মনমানসিকতার সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ ও তাঁর জীবনের সবচাইতে দীর্ঘমেয়াদি চাকরি। সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ও পুস্তক প্রকাশনার কাজে জড়িত থেকে এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে খুব কাজে লেগেছিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে তিনি বুক সেন্টারের সরকারী পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ন্যাশনাল বুক সেন্টারের নাম যখন “জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র” করা হয়, তখন সরদার জয়েনউদ্‌দীন এর পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। এককথায় তাঁকে ‘জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের’ প্রকৃত স্থপতি বলা হয়। সরদার জয়েনউদ্‌দীনকে এই পদে বেশ কয়েক বার বিদেশে যেতে হয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক, জার্মানি প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত বইমেলাগুলোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সূত্রে তাঁকে প্রতিনিধিরূপে সেসব দেশে যেতে হয়। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটের বইমেলায় বাংলাদেশ স্টল রৌপ্যপদক পায় এবং সেই সাথে তিনি নিজেও একটি বিশেষ পদক লাভ করেন। ১৯৫৭ সনেও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় লেখক সম্মেলনে প্যাকিস্তানের লেখক প্রতিনিধি হয়ে সরদার জয়েনউদ্‌দীন অংশগ্রহণ করেন।

কিশোর বয়সে স্কুলে পড়ার সময় সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কবিতা রচনার হাতে খড়ি। শিশুতোষ কবিতা ও ছড়া তিনি অনেক লিখেছেন। অবশ্য কবি হিসেবে তিনি কোনো পরিচিতি পাননি কিন্তু ছড়াকার হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্যও বটে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

'তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন একখানা কবিতা স্কুলের খাতায় লিখেছিলাম। শিক্ষক তো তা দেখে রেগে আগুন হয়ে আমাকে প্রহার করেন। অবশ্য ৭ম শ্রেণীর ছাত্র যখন-ঠিক সে সময় আমার একটা কবিতা কোন এক সাময়িকীতে ছাপার অক্ষরে বের হয়। সেটা ১৯৩২ সালের কথা। এর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কবিতার ছন্দ দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তাঁর আশীর্বাদ পেয়েও একখানা জবাব পেয়েছিলাম। সম্ভবত সেটাই ছিল আমার বড় তৃপ্তি।' (বাংলার মুখ ১৯৭৩-সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত)[১০]

কলেজে পড়ার সময়ই মূলত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতি পর্ব আরম্ভ হয়। তাঁর বন্ধু আবদুল গণি হাজারী, কামরুল হাসান প্রমুখ তখন কলকাতায়। কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । এঁদের সঙ্গ থেকেই তিনি ক্রমশ শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য খুঁজে পান। এছাড়া সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আপদকালীন সংকট, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং সাধারণ মানুষের দুর্বিসহ জীবন। যুদ্ধশেষে মানুষের সংকট ও জটিলতা আরও ঘনীভূত হয়। এর মধ্যদিয়ে চলতে থাকে দেশভাগের প্রস্তুতি। এই সময়ের নানা তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য রচনার পটভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গল্পকার হিসেবে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের আবির্ভাব ঘটে। সরকারি পত্রিকা 'মাহে নাও' 'সওগাত' এই সব পত্রপত্রিকায় তিনি মাঝে মাঝে গল্প লিখতেন। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গল্প 'নয়ানঢুলী', 'মাহে নাও' পত্রিকায় ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সিকান্‌দার আবু জাফরের অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগেই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ '*নয়ানঢুলী*' প্রকাশিত হয়। '*নয়ানঢুলী*' বের হয় ১৯৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ইং)। এতে সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো হলো-করালী, ভাবী, কানা ফকিরের ব্যাটা, ফুলজান, কাজী মাস্টার, সবজান, নয়ানঢুলী। '*নয়ানঢুলী*'র গল্পগুলোর পটভূমি গ্রাম। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বিপর্যস্ত গ্রামীণ জীবনের চিত্র। পাত্র-পাত্রীরা সবাই খুবই সাধারণ

স্তরের, খেটে খাওয়া সামাজিকভাবে অবজ্ঞাত মানুষ। এরা সকলেই অসম সামাজিক ব্যবস্থার অসহায় শিকার।

এর তিন চার বছরের ব্যবধানে তাঁর '*বীরকণ্ঠির বিয়ে*' (১৩৬২) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের গল্প সংখ্যা বারো, গল্পগুলো হলো বাতাসী, রঙিলা আসমান, বয়াতী, ইজ্জত, গোলাপীর সংসার, কোয়েলা, নসিমন, কুলটা, তালাক, জীবনচক্র, উজান বাঁক, বীরকণ্ঠির বিয়ে। '*বীরকণ্ঠির বিয়ে*' গ্রন্থের গল্পগুলোতে নারী চরিত্রের প্রাধান্য, ভাষারীতিতে নতুনত্ব কিছু নেই। 'নয়ানঢুলী'র মতোই ভাষা সহজ ও প্রসাধনবিহীন।

'*খরস্রোত*' প্রকাশিত হয় (১৩৬২)। এতে এগারোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। যেমন– উপকথা, পাষাণ, কসম, মাটি, খরস্রোত, ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা, কুকুর, দ্রৌপদী, সামাজিক, বকসো আলী পণ্ডিত, আলীজান। এই গল্পেগ্রন্থের পটভূমিও মূলত গ্রাম। এ গল্পগ্রন্থে তাঁর বক্তব্য তীব্র ও প্রত্যক্ষ। নিষ্পেষিত জনগণ অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে ও সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে আরম্ভ করেছে।

এর প্রায় পনেরো বছর পর তাঁর চতুর্থ গল্পগ্রন্থ '*অষ্টপ্রহর*' (১৩৭৭) প্রকাশ পায়। এর গল্পসংখ্যা চৌদ্দ। মাটির দামে দাম, মা, গোয়েন্দা, বোরকা, সিঁধেল, জন টমাস মণ্ডল, দুটো জীন ও একটি প্রেম, প্রতিবিম্বের মৃত্যু, পাতকুয়ার আত্মহত্যা, মামলা, মানুষের মত মেয়ে মানুষ, নাগিনী, কারফিউ, এক অঙ্গ দুটি মুখ। এতে বক্তব্যধর্মিতার বদলে কাহিনী বর্ণনাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মানবিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি, হৃদয়বোধ ও আবেগ অধিকাংশ গল্পের বিষয়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সর্বশেষ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ '*বেলা ব্যানার্জীর প্রেম*' এ (১৩৮০)। '*বেলা ব্যানার্জীর প্রেম*' গল্পসংখ্যা দশ। প্রেমময়ী সাপ, তেল, বেগম শেফালী মির্জা, আবেগের ধ্বংসস্তূপে, সৈনিকের পুনর্জন্ম, কাকপিতা, একটি পরাজিত আত্মহত্যা, ঘুঘুর পালক, প্রাণিজ, বেলা ব্যানার্জীর প্রেম। এর গল্পগুলো কাহিনীমুখ্য ও কোনো কোনো গল্প বেশ দীর্ঘ।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন সাহিত্যজীবনে পদার্পণ করেন ছোটগল্পের হাত ধরে। পরে তিনি উপন্যাসের বৃহত্তর ও বিস্তৃত পরিসরে আসেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস '*আদিগন্ত*'

(১৩৬৫)। উপন্যাসটি তাঁর প্রথম জীবনের গল্পগুলোর মতোই গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাথে বিপর্যস্ত পাবনা জেলার এক অখ্যাত গ্রামকে কেন্দ্র করে '*আদিগন্ত*' উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত। এটি একটি মিলানাত্মক উপন্যাস। উপন্যাসটির ভাষারীতিতে যথোচিত উৎকর্ষ না থাকলেও রোমান্টিক চেতনা ও মানবিক আবেদনে উপন্যাসটির মূল্য। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস '*পান্নামোতি*' (১৩৭১) একটি রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস। আদিগন্তের সাধুরীতি পরিত্যাগ করে এ উপন্যাসে তিনি চলিত রীতি গ্রহণ করেছেন। এর খুব কাছাকাছি সময়ে তৃতীয় উপন্যাস '*নীল রঙ রক্ত*' (১৩৭২) প্রকশিত হয়। উনিশ শতকের পাবনা অঞ্চলের নীলচাষ বিরোধী চাষী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ইতিহাসের ঘটনার আলোকে একটি কল্পিত উপাখ্যান। এতে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ভাষাভঙ্গি অনেক উন্নত। চতুর্থ উপন্যাস '*অনেক সূর্যের আশা*' (১৩৭৩) একটি বৃহদায়তন উপন্যাস। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে উনিশ শ সাতচল্লিশের ভারত বিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক হিসেবে সরদার জয়েনউদ্‌দীনকে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য ও পুরস্কার এনে দেয়। এর ভাষাভঙ্গিতে পরিণত ছাপ রয়েছে। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। '*বেগম শেফালী মির্জা*' (১৯৬৮) তাঁর পঞ্চম উপন্যাস। এটি 'বেগম শেফালী মির্জা' গল্পের একটি বর্ধিত রূপ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫)। আয়তনের দিক থেকে উপন্যাসটি সবচাইতে বৃহৎ। এ উপন্যাসের কাহিনী 'অনেক সূর্যের আশার' পরবর্তী পর্যায়।

'*শ্রমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী*' (১৩৮০) সরদার জয়েনউদ্‌দীনের একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। এছাড়া তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস '*কদম আলীদের বাড়ি*' ১৯৮২ সনে প্রকাশিত হয়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর শিশুসাহিত্য। তাঁর লেখক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি শিশুতোষ গল্প, ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর এসবলেখা 'টাপুর-টুপুর', 'সবুজ পাতা', 'শিশু', 'নবারুণ', কিশোর বাংলা', 'ধান শালিকের দেশ' ইত্যাদি শিশু কিশোর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'শাহীন' পত্রিকাতেও তাঁর কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে '*অবাক-অভিযান*' (১৩৭১, '*উল্টো রাজার দেশ*' (১৩৭৬),

‘টুকুর ভূগোল পাঠ’ (১৯৭৯) ও *‘আমরা তোমাদের ভুলব না’* (১৯৮১)। প্রথম দুটি রূপকধর্মী রচনা *‘টুকুর ভূগোল পাঠ’* গল্পের আকারে পরিবেশিত বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ, *‘আমরা তোমাদের ভুলব না’* মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রচিত উপন্যাস। তরুণ বয়স থেকেই সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সাধ ছিল কবি হওয়ার। কিন্তু পরিণত বয়সে গল্প, উপন্যাস লেখার ফাঁকে তিনি প্রচুর ছড়া লিখেছেন। ছড়া রচনায় তাঁর দক্ষতা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। অথচ তাঁর কোনো ছড়ার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই সমস্ত অসংখ্য ছড়া তিনি তাঁর নোটবইতে লিখে রেখেছিলেন। এগুলোর কিছু কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত, অধিকাংশই অপ্রকাশিত। তাঁর এ ছড়াগুলো বেশীর ভাগই রাজনীতি ও সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টকণ্ঠ ও ভঙ্গিতে ব্যঙ্গমূলক। এছাড়া তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়া এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়বিষয়ক ছড়া সমাজ সচেতনতা ও মানবিক চেতনার পরিচয় বহন করে। তিনি শিশু একাডেমীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর শেষজীবনে সরদার জয়েনউদ্‌দীন লেখালেখি নিয়েই সময় কাটাতেন। সাহিত্য সভা, বাইরে কোথাও তেমন বেরোতেন না, নিজেকে এক প্রকার আড়াল করে রেখেছিলেন তিনি। ১৯৭০ এর দিকে তিনি একবার দুর্ঘটনায় পড়েন। হাসপাতালে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি জানতে পারেননি তাঁর কোথায় লেগেছে। প্রায় এক বছর পর এক্সরেতে ধরা পড়ে তাঁর বুকের দুটো হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং ফুসফুসও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। এই নিয়েও তিনি বছর দশেক ভাল ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টে ভুগতেন এবং সেটি মারাত্মক আকার ধারণ করে ১৯৮৬ এর শেষ দিকে। ডিসেম্বরের দিকে তাঁর শ্বাসকষ্ট জনিত অসুস্থতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। ২০ ডিসেম্বর তিনি বাকরুদ্ধ ও অজ্ঞান হয়ে যান। ২১ ডিসেম্বর রাত ২.৫০ মিনিটে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের মৃত্যু হয়। মীরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। একজন বাঙালি মুসলিম কথাসাহিত্যিক হিসেবে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের আর্বিভাব। তাঁর কথাসাহিত্যে তিনি গ্রাম জীবনকে একান্ত নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান, পেশা, জীবন অনুভূতি এবং তাদের পরিপার্শ্ব ও সামগ্রিক আবহ তাঁর কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', *কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম শোভন সংস্করণ ফাল্গুন ১৪০৬, ঢাকা, জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, পৃ. ৫৪৩

২. বিস্তৃত পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য : Dr. K. C. Chowdhury, *Role of Religions in Indian Politics* (1900-1925), 1978 Delhi, P. 232-233.

৩. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, ঢাকা মুক্তধারা, পৃষ্ঠা-৯৮।

৪. অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, ১৯৭২, কোলকাতা, রত্না প্রকাশন, পৃ. ৩১

৫. (উদ্ধৃত) রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৮

৬. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র, ১৪১৫/ এপ্রিল ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৩

৭. আহমদ কবির, *সরদার জয়েনউদ্‌দীন* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.৯

৮. (উদ্ধৃত), ঐ, পৃ. ২২

৯. (উদ্ধৃত), ঐ, পৃ. ২২

১০. আহমদ কবির, *সরদার জয়েনউদ্‌দীন* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গ্রামজীবনের রূপায়ণ

বাংলাদেশ গ্রামীণ সভ্যতানির্ভর। যেহেতু সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণ 'তাই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন চর্যাপদের গ্রামীণ জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের একাধিক উল্লেখ লক্ষণীয়।'[১] আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিও গ্রামকে কেন্দ্র করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নির্ভর এ সমাজ ব্যবস্থা এদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের আগ পর্যন্ত টিকে ছিল। 'কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুযায়ী ধীরে ধীরে নগরের প্রসার ঘটায় গ্রামীন সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে ধনতন্ত্র ক্রমশই পরিপুষ্টি লাভ করে'[২] এই পরিবর্তন অথবা ক্রমবিবর্তন সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তথাপিও গ্রামীণ জীবনকে অবলম্বন করেই বিভাগোত্তর বাংলাদেশে কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা গ্রামকে তাঁদের সাহিত্যের প্রধান পটভূমি হিসেবে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সাথে তুলে ধরেছেন। আমাদের দেশের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো এদেশের সাহিত্যিকদের শেকড়ও গ্রামেই প্রোথিত। আর এর ফলেই তাঁরা গ্রামের চিরচেনা পরিবেশের প্রতি অনুভব করেছেন নাড়ির টান। তাই গ্রামের মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা, দরদ, মমত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সাহিত্যিকেরা তাঁদের কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন সেসব মানুষেরই বিচিত্র জীবনভাবনা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা-পূর্ণতা-অপূর্ণতার অনবদ্য সমস্তকাহিনী।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে গ্রামজীবনের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন অসংখ্য লেখক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মাহবুব-উল-আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৮৪), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-   ) প্রমুখ।

মুক্ত বুদ্ধি ও সুস্থ চেতনার আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। তাঁর বিশাল ও বিচিত্র কর্মময় জীবনের চারটি স্তম্ভ হচ্ছে আইন, রাজনীতিচর্চা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য। একজন আইনজ্ঞ হিসেবে অভিজ্ঞতা, রাজনীতিসূত্রে

সমাজসংলগ্নতা এবং সাংবাদিক হিসেবে সচেতনতা তাঁকে শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ করেছিল। আবুল মনসুর আহমদের দক্ষতা ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক রচনায়। স্যাটায়ারের আলোকেই তিনি সমাজ ও মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পেয়েছেন বিশেষ খ্যাতি। বিচিত্র মানুষ ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড তাঁকে ছোটগল্প রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। তাঁর রচনা সম্পর্কে আজহার ইসলামের মন্তব্য–

> 'রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্য করেছেন নির্বাচনের নামে প্রহসন, ভোট কেনাবেচার ব্যবসা, মন্ত্রিত্বের নামে পকেট ভারি করার কৌশল, শাসনের নামে শোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য নিজের দলের প্রতি অপরিমেয় ভক্তি ও প্রীতি, পারমিটবাজদের তোষণনীতি, ফটকাবাজি ব্যবসায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ব্যাপার, দলীয় স্বার্থের খাতিরে দলন ও দমননীতি। সামাজিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলাদলি, দুর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন, ব্যভিচার, অনাচার ও মিথ্যাচার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখেছেন ভণ্ডামি, মূর্খতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, লোভ-লালসা, আসঙ্গ-লিপ্সা, কুসংস্কার ও মোল্লা-মৌলভীদের পারস্পরিক কুৎসা রচনা, হীনমন্যতা, ইসলামি শিক্ষার নামে প্রগতিবাদী ধ্যান-ধারণায় বিরোধিতা ও সম্প্রদায়িক কলহে ইন্ধন সৃষ্টি।'[৩]

আবুল মনসুর আহমদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– '*আয়না*' (১৯৩৫), '*ফুড কনফারেন্স*' (১৯৪৪), '*আসমানী পর্দা*' (১৯৬৩) ও '*আবে হায়াত*' (১৯৬৮)। '*আয়না*' গল্পগ্রন্থটির ব্যঙ্গক্ষমতা লক্ষ করে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

> 'আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যঙ্গ কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতই করুণ।'[৪]

গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও তথাকথিত পীরদের ভণ্ডামির বিষয়গুলো '*আয়না*' গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো গল্প 'হুজুর কেবলা' ও নায়েবে নবী' ভণ্ডপীর ও তাঁর সাগরেদরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে, ধর্মকে ব্যবহার করে যে অধার্মিক কাজে লিপ্ত হয় ও সামাজিক ব্যভিচারে মেতে ওঠে তাই 'হুযুর কেবলা'র কাহিনী। এই কাহিনীর সত্যদ্রষ্টা এক গ্রাম্য যুবক এমদাদ।

ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় দলাদলি, অবজ্ঞতার অন্ধকার, ও ভণ্ডামি নিয়ে ইমাম ও মওলানাদের যে ধর্মব্যবসা এই বিষয়গুলো নিয়ে 'নায়েবে-নবী', 'মুজাহেদিন' ইত্যাদি গল্পও রচিত হয়েছে। এ গল্পগুলোতে হানাফি মোহাম্মদী বিষয়গুলোকে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবুল মনসুর ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। ধর্মীয় পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন মক্তবে। ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার সেতুবন্ধন সুন্দরভাবে ঘটাতেও পেরেছিলেন তিনি। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বীভৎসতার দিকগুলো তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে সাহিত্য জগতে মাহবুব-উল-আলমের আর্বিভাব ঘটে। এ সময়ে মুসলিম সমাজ-জীবন নানা রকম সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল। আর্থিক দীনতা, সামাজিক হীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অশিক্ষার অন্ধকার, কুসংস্কারের চাপে গ্রামের মানুষের যে দুর্বিষহ ও মানবেতর জীবন তার ছবিই মাহবুব-উল-আলমের গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন সমাজ-সচেতন ও সংবেদনশীল শিল্পী। একজন প্রথমশ্রেণীর গল্পকার না হলেও বাংলা ছোটগল্পের অতীত পরিক্রমায় তিনি বিশিষ্ট একজন। '*তাজিয়া*' (১৯৪৬) ও '*পঞ্চ অন্ন*' তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ।

'*তাজিয়া*' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'তাজিয়া' গল্পে মুসলমানদের মহরম পর্ব নিয়ে গ্রামের দলাদলির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ঈর্ষা-রেষারেষিতে বিস্তার লাভ করেছে। তবে গল্পটিতে মুসলিম ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে ঐতিহ্যগত একটি অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। গল্পটির বর্ণনায় মাহবুব-উল-আলম চমৎকার সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন।

পল্লীর সমাজ-জীবন নিয়ে রচিত 'ঈদ' গল্পটি। লেখক তাঁর স্বভাবসুলব কৌতুক রসের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে ঈদের অনুষ্ঠান, গ্রামের কুসংস্কার, পীর-মুনশীদের ভণ্ডামি ও লোভ-লালসা তুলে ধরেছেন।

‘কোরবানী’ *তাজিয়া* গল্পগ্রন্থের সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গল্প। এর মূল চরিত্র কোরবানীর এক পশু, একটি গরু। ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি অনুযায়ী কোরবানীর ঈদে পশু জবাই করা হয়। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রিয় জীবনের উৎসর্গই এর মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে জীবের প্রতি ভালবাসাই গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মাহবুব-উল-আলমের ‘য়ানব্যালেন্সড’ গল্পে জীবনের একটি নির্মম দিক প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশের একটি সামাজিক ব্যাধি দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। এভাবেই সুদখোর মহাজনদের শোষণের ফলে ঋণদাতার প্যাঁচে পড়ে ঋণীকে বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি ছাড়তে হয়।

লেখকের গল্পের ঐতিহ্য চেতনা তাঁর মুসলিম মানসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। সমকালীন সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে মাহবুব-উল-আলমের গল্পে তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, শুভ অশুভবোধ, প্রকৃতি ও মানুষ অকৃত্রিমভাবে ধরা পড়েছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) যখন শিশু, মুসলিম সমাজ তখন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যতটা নিষ্ঠাবান ছিল ঠিক ততটাই বিমুখ ও বিতৃষ্ণ ছিল পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি। যা পরবর্তীকালে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রবহমান কুসংস্কার রূপে সমাজের অগ্রগতির বলে পর্বতপ্রমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করে। সে সময়টাতে আরবি পড়াটাই ছিল মুসলিম সমাজের রেওয়াজ। আবুল ফজলের পূর্ব পুরুষ আরবি পড়াতেন এবং পাড়ায় পাড়ায় মিলাদ পড়াতেন। এতে পরিবারের কিছু আয় হতো। মূলত এই পরিবেশেই লেখকের শৈশব কাটে। এবং সমাজের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁর ছেলেবেলার মন-মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবুল ফজলের প্রাথমিক শিক্ষাও মুসলিম ধর্মের রেওয়াজ অনুযায়ী জনৈক মিয়াজীর তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়। মিয়াজীর দায়িত্বে আমপারা, কোরআন শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ চলে। পরে তিনি চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। সেখানে ইংরেজি,বাংলা, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল।

আবুল ফজল যখন মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখনই তাঁর সুপ্ত চৈতন্যে ও মননের নিভৃত অঞ্চলে সাহিত্যের ছায়া বিস্তার করে। পরে বিশের দশক থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ১৩৩০ সালের কার্তিক সংখ্যায় কল্লোল পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা 'একটি আরবি গল্প' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রকাশিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' যা পরবর্তীকালে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। এই সমাজ তথা আন্দোলনের সঙ্গে আবুল ফজলের যোগ ছিল নিবিড়।

আবুল ফজল মূলত সমাজ সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর গল্পে সমাজ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের রূপটি তিনি পরম মমতায় তুলে নিয়েছেন। নরনারীর দু:খ বেদনার মূলে যে সমাজের ধনী ব্যক্তির হাত, তাদের জীবনের নির্মম সমাপ্তির পেছনে যে ধর্মীয় অন্যায় বিধানের রূপ, লেখকের উদ্দেশ্যই ছিল তা প্রচণ্ড বিদ্রোহের রূপ ধারণ করুক। সমাজ নিগৃহীত ব্যক্তি মানসের প্রতি পাঠকের মন দরদী হোক, সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি পাঠক বিক্ষোভ করুক। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হল– '*মাটির পৃথিবী*' (১৩৪৭), '*আয়ষা*' (১৩৫৮), '*শ্রেষ্ঠ গল্প*' (১৩৭১), '*স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন*' (১৯৭৮) এবং '*মৃতের আত্মহত্যা*' (১৯৭৮)।

আবুল ফজলের একটি উল্লেখ্যযোগ্য গল্প 'মাটির পৃথিবী'। বাংলার গ্রাম জীবনের শাশুড়ী-বধূর সনাতন ঝগড়ার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গল্পের রস জমাট বেঁধেছে। বিষয়টি তেমন অভিনবত্বের দাবি করে না। কোনো সামগ্রিক জীবন চেতনার পরিচয়ও এতে নেই। ফুলজানের মা, ছলিম এসব চরিত্র নিম্ন-মুসলিম সমাজের সমস্যাপীড়িত পরিবেশে লালিত। জন্মগতভাবে এরা যে জীবনের সাথে পরিচিত, আর বাইরে যে একটি সভ্য জগতের অস্তিত্ব আছে, সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। এই অজ্ঞাতকুলশীলদের প্রতিও লেখকের দরদের অন্ত নেই। আঞ্চলিক সংলাপ পরিবেশ-মুখর কাহিনী ও চিত্র চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। হামিদুল্লাহ শিকদার এবং তার খুড়তুত ভাই এই উভয়ের পারিবারিক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'মা'র কাহিনী। যা গ্রাম বাংলার একটি চিরাচরিত পারিবারিক সমস্যা। বংশ মর্যাদায় খাটো হামিদুল্লাহর শ্বশুরকুল সম্পর্কে তাঁর নিজের লজ্জাবোধ তাকে অহরহ পীড়া দিতো। মা বাবার একান্ত ইচ্ছায় তাকে এই ছোটবংশে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে সেই ছোটলোকের মেয়ে আয়েষার

মর্মান্তিক বেদনার বার্তা কে-ই বা শোনে। দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলার সঙ্গে কিন্তু হামিদের বনাবনি হলো না। এই নিয়ে মামলা মোকাদ্দমা বাধে। গ্রামবাসীদের ফতোয়ার জোরে প্রমাণিত হলো প্রথম পক্ষ আয়েষার সঙ্গে তার তালাক হয়ে গেছে। হামিদ এ শোক সহ্য করল না। শীঘ্রই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই সাদামাটা গল্পটির মধ্যে লেখক কারুণ্যের এক মর্মান্তিক চিত্র উদঘাটন করেছেন। আয়েষার প্রতি অন্যায় আচরণে মৃত্যুকালে হামিদুল্লাহর মনে যে প্রতিক্রিয়া জন্মে সেটা প্রকাশ পায় মৃত্যু পথযাত্রীর কয়েক ফোঁটা অশ্রুর বাহিরাগমনে।

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে রচিত 'বিবর্তন' গল্পটি আবুল ফজলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প। মানব মনের আদিম কামনার জোরালো অভিব্যক্তিতে গল্পের রস অন্য এক স্বাদ নিয়ে জমাট বেঁধেছে। মসজিদের ইমাম হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন ও পঙ্গু মেয়ে লুলির যৌন জীবনের ইতিবৃত্তই মূলত গল্পের বিষয়।

আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ তৈরীর দ্বারা আবুল ফজল কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন। তাঁর এ জাতীয় গল্পে সমাজ একটি পরিপ্রেক্ষিৎ রচনা করলেও মানুষের অন্তর্জীবনের চিত্রায়ণই এখানে বিষয়ের মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' এ জাতীয় এক বিশেষ ধারার গল্প। এই গল্পের বসির প্রথম তিন বৌ মরার পর পাড়ায় 'বৌ-খোর' বলে পরিচিত হয়। শরৎ কবিরাজের সঙ্গে তার সে কথাবার্তা হয় তার একটি উদাহরণ-

> 'দুলির মৃত্যুর পর শরৎ কবিরাজ উঠে যাবার সময় বসিরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলেছিল-এত ভারী ঔষধেও যে অন কোন ফল ন অইল তঅন মনে হঅর যে তোঁয়ারে গ্রহদোষে পাইয়ে। নঅইলে তিন তিনটা বৌ মরার কোন কারণ নাই।'[৫]

জীবিকার তাগিদে সাংবাদিকতা এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য-সাধনা–এই দুটো অবিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জীবনভর সংশ্লিষ্ট ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। কালিগঞ্জের দক্ষিণবাগ গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত আলেম পরিবারে তাঁর জন্ম। তৎকালীন আর পাঁচটা মুসলিম পরিবারের মতো এ পরিবারটি ও গোঁড়ামির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। তবে আবু জাফর শামসুদ্দীনের পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার রেওয়াজ ছিল।

তাঁর প্রথম জীবনের চলার পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। মধ্যবিত্ত পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর সাহিত্যজীবনের উন্মেষ ঘটে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে। এ সময়ে তিনি খুলনায় চাকুরিরত ছিলেন। নিজের সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচিতি, ক্ষেত্র তৈরী করতেও তাঁকে নানা বৈরী প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। লড়াই করেছেন তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির সঙ্গে। এছাড়া ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যজনিত প্রতিবেশ তাঁর সাহিত্যে কখনো কখনো প্রকাশ পায়। অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যিক চেতনায় যুক্ত হয়েছিল মুক্তবুদ্ধি ও সুস্থ চেতনা।

পল্লীর জীবনাচরণের নানা বিষয়কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য করেছেন। আজকের দিনে দেশব্যাপী যেভাবে নগরায়ণের ঘটা পড়েছে, তাতে বিশুদ্ধ গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্বাদ নিয়ে এখন আর তেমন গল্প রচিত হয় না। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুরোনো ধারার দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি এখনকার গল্পের টেকনিক যেমন বদলেছে, তেমনি বিষয় নির্বাচনও হয়েছে একালের মানুষের স্বাদ আর রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সেই স্বাদ আর রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগর-জীবনমুখী। এখনকার শিল্পকৌশল ও অভিনব সন্দেহ নেই। তবে পুরোনো রীতির সাহিত্যের ধারা যতই পুরোনো হোক, সাময়িকতা নিয়েও তার একটি আলাদা স্বাদ আছে, আমাদের অতীত তাতে মহার্ঘ রূপেই জেগে ওঠে। যার শৈল্পিক মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। আবু জাফর শামসুদ্দীনের গল্পগ্রন্থগুলো হল– '*জীবন*' (১৯৪৮), '*শেষ রাত্রির তারা*' (১৯৬৬), '*এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য*' (১৯৬৭), '*রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা*' (১৯৭৮), '*ল্যাংড়ী*' (১৯৮৪)।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাধারণ আর সাদামাটা একটা গল্প 'তালাক'। পল্লী গ্রামের একটি সাধারণ বিষয়কে উপজীব্য করে গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। জয়তুন পাঁচ ছেলের মা। তার স্বামী আইজদ্দিন তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ ছিল না। আইজদ্দিন তেমন সবলকায় পুরুষ নয় অন্যদিকে জয়তুন গায়ে গতরে এবং শক্তি সামর্থ্যে বেশ দশাসই চেহারার এক নারী। একদিন সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরে ভাত চাইতেই স্ত্রী তাকে জানায় ভাত রান্না হয়নি। ফলে আইজদ্দিন স্ত্রীর পিঠে কিল বসিয়ে দেয়। জয়তুনের সহ্য হলো না সেও আইজদ্দিনকে দু'হাতে জাপটে ধরে খামের সঙ্গে বেধে রাখে।

ঘটনা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়। আইজদ্দিন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনবার তালাক বাণী উচ্চারণ করলো। মুন্সী সাহেব ফতোয়া দিলেন, দু'জনের কারো মুখ আর দেখা চলবে না। এ গল্পের কাহিনী একটি গ্রামীণ বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তব। গ্রামের মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিধানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই বিধানের জন্যই সামান্য মৌখিক একটি মাত্র বাক্যের অসীম দাপটে আইজদ্দিন-জয়তুনের দীর্ঘদিনের সংসারটি মুহুর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এই গল্পে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

তাঁর আর একটি গল্প 'উঙ্গিল গোশত'। এটিও গ্রামীন পটভূমিতে সামাজিক অসঙ্গতির প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত অসহায় দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। স্ত্রী রাহেলা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাবিলের সংসার ভালোভাবেই কাটছিল। এমনিতেই দারিদ্র্যের সংসার তার উপর চাকরি হারাবার ফলে অভাব আরো জেঁকো বসল। ছোট মেয়ে জরিনা এর মধ্যে একদিন উঙ্গিল গোশত খাবার জন্য বায়না ধরল। ধনী প্রতিবেশী রাবেয়াদের বাড়িতে গিয়ে সে রানের হাড্ডিটি কিভাবে পেয়েছে এবং খেয়েছে তার বর্ণনা দেয় মায়ের কাছে। এর মধ্যে কাবিল আড়ালে মেয়ের কথাগুলি শুনে ফেলে। এরপর কাবিল-

> 'চক্ষের পলকে রান্নাঘরে ঢুকে, বাজ পাখী যেমন ছোঁ মেরে তার শিকার নিয়ে যায় তেমনি জরিনাকে তার মার কোল থেকে ছিনিয়ে বাইরে নিয়ে এলো এবং তার সোনালী চুলের ঝুঁটিতে ধরে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে। মুখে বলল: হারামজাদী মুরগীর উচ্ছিষ্ট হাড্ডি মাটি থেকে কুড়িয়ে খেতে গেলি ও বাড়ি ?'[৬]

সৃজনশীলতার চলতি প্রবহমানতাকে যিনি অসাধারণ কুশলতায় আত্মগত করে নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেই নামখ্যাত কথাশিল্পী হলেন শওকত ওসমান। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন সে সময় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সগর্বে আত্মপ্রকাশ করে তার শিখর স্পর্শ করা যে কোনো মুসলমান সাহিত্যেকের পক্ষে ছিল খুব দুরূহ ব্যাপার।

বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানগণ ছিল বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নানা সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থায় মুসলিম সমাজের সমস্যাগুলো যে আরও প্রকট হয়ে উঠবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সুখের কথা এই যে মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনের অনেক সমস্যা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তখন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ধীরে ধীরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছিলেন, সেই শুভক্ষণে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিছু সংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে চকিতে, যাঁদের রচনায় সৃজনীলতার সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে বাংলাদেশের জীবন ও পরিপার্শ্ব উজ্জ্বল রেখায় পরিষ্ফুট হতে শুরু করে।

হুগলীর সবলসিংহপুর গ্রামে শওকত ওসমানের জন্ম। সেসময় বাংলার আর দশটা মুসলমান পরিবারের মতো শওকত ওসমান ও কিছুকাল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছিলেন। এই আরবি শিক্ষাটা তাঁর সাহিত্য জীবনে ব্যর্থ হয়নি তা বোঝা যায় যখন মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও মুসলমানদের প্রিয় চৌকস আরবি শব্দগুলোর লাগসই প্রয়োগ ঘটান তিনি তাঁর কথাশিল্পের বহমান ধারায়।

শওকত ওসমান দেশ-কাল-পাত্র কে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর গল্পে যুগ, জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম কায়দায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মধ্য দিয়েই চমৎকার শিল্প ব্যঞ্জনা লাভ করে। আরবি, ফারসি শব্দের দেদার ব্যবহার করেছেন শওকত ওসমান তাঁর গল্পে। তিনি জীবনকে নিয়ে কখনো কৌতুকও করেছেন। শওকত ওসমানের বেশ কয়েকটি গল্পের বই রয়েছে– ‘*পিঁজরা পোল*’ (১৩৫৮), ‘*জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*’ (১৩৫৮), ‘*সাবেক কাহিনী*’ (১৯৫৩), ‘*প্রস্তর ফলক*’ (১৯৬৪), ‘*উভশৃঙ্গ*’ (১৩৭৫), ‘*উপলক্ষ্য*’ (১৩৭৫) ‘*নেত্রপথ*’ (১৯৬৮), ‘*প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প*’ (১৯৬৯), ‘*শ্রেষ্ঠ গল্প*’ (১৯৭৪), ‘*জন্ম যদি তব বঙ্গে*’ (১৯৭৫), ‘*নির্বাচিত গল্প*’ (১৯৮৪) ‘*নি:সঙ্গ নির্মাণ*’ (১৯৮৫), ‘*এবং তিন মির্জা*’ (১৯৮৬), ‘*মনিব ও তাঁর কুকুর*’ (১৩৯৩), ‘*পুরাতন খঞ্জর*’ (১৯৮৭), ‘*ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী*’ (১৯৯০), ‘*বিগতকালের গল্প*’ (১৯৯৩) ইত্যাদি।

লেখকের প্রথম গল্প 'জুনু আপা' পাড়াগাঁয়ের সস্তা রোমান্টিকতার সোজা পথ ধরে নিতান্ত গতানুগতিক পরিণতিতে এসে শেষ হয়েছে। গ্রামের সহজ, সরল মেয়ে জুনু। চাচাতো ভাই জসিমের সঙ্গে তার ভালবাসা পারিবারিক বাধায় সাফল্য লাভ করে না। ভালবাসার ব্যর্থতাই মেয়েটির জীবনের ব্যর্থতা ডেকে আনে। সে আশ্রয় নেয় পঞ্চাশোর্ধ মালেক সাহেবের নির্বান্ধব পুরীতে। পরে মালেক সাহেব তাকে বিয়ে করে।

'নতুন জীবন' গল্পটির তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এতে শওকত ওসমান গোমতী নদীর সাথে ফরাজ আলীর নিবিড় সম্পর্কের যে একটি অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, সেটিই এ গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। প্রতিবেশী ব্যক্তিটি যখন ফরাজকে বলে, 'চলেন মিয়া বাই', চইলা যাই এহান থেইক্যা', তখন সে নির্বিকারে বলে, 'যামু কোথা? এই হালির লগে বড় পীরিত আর কোথাও মন যায় না'[৭] নদীমার্তৃক বাংলাদেশকে জীবনের তাৎপর্যে মন্ডিত করে এক চমৎকার অভিব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন তিনি তাঁর এই গল্পে।

'মোজেজা' শওকত ওসমানের এক বিশেষ ধারায় গল্প। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আগের মতো এখনো ধর্মের নামে ব্যবসা করার বিষয়টি বেশ জমজমাট। শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দু'জনের রচনায়ও এ জাতীয় কাহিনীর একটা জীবন্ত উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়।

'সাবেক কাহিনী'র 'বকেয়া', 'ভাগাড়' ইত্যাদি গল্পগুলোতে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার সামাজিক অসাম্যের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস দেখা যায়। 'বকেয়া'য় জমিদার কর্তৃক পাচুর ভিটে গ্রাস করার কাহিনী, 'ভাগাড়' গল্পে ভোট পাওয়ার লোভে গরু জবাই' করে গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে মনসুর আলীর গোশত বিলি করার ভণ্ডামির চিত্র আঁকা হয়েছে।

মনস্তত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসার অভিমুখী যে কথাশিল্প, বাংলা কথাসাহিত্যের সেই বিশিষ্ট শিল্পবলয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর জীবনের পরিধি পঞ্চাশ পেরোবার আগেই শেষ হয়েছে। এই স্বল্পায়ু জীবনে তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন, তিরিশ-

একত্রিশ বছর। ১৯৩৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত ‘সীমাহীন এক নিমেষে’ গল্পটিই সম্ভবত তাঁর সাহিত্য যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ।

চট্টগ্রামের ষোলশহরে এক আভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পার হয়ে ১৯৪৫ সালে যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ পরলোকগমন করেন। ফলে জীবিকার তাগিদেই তাঁকে পড়াশোনার ইতি টানতে হয়।

‘দ্য স্টেটস্‌ম্যান’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে তাঁর চাকুরিজীবন আরম্ভ হয়। ১৯৫১ সাল থেকে তিনি বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ সালে জার্মানীর বনে ফার্স্ট এ সেক্রেটারি রূপে নিয়োজিত হন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্যারিসে চাকুরি করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনকালের এই পরিধি থেকে বোঝা যায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করেছেন তিনি বিদেশে। কর্মসূত্রই যে তার কারণ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রবাস জীবন তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে। সে প্রভাব অবশ্যই তাঁর রচনাশৈলী ও প্রকরণের উৎকর্ষে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তুর অনিবার্য আহরণ ঘটেছে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তে লালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত, অপরাধ, লোভ-লালসা-ভণ্ডামি ভরা বিচিত্র বৃত্তীয় চাহিদার তীক্ষ্ণ অনুভব থেকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিদেশে অবস্থান করলেও তাঁর মানসলোকের বিচরণ ছিল স্বদেশে। সাহিত্যের সাধনায় তাঁর অন্বিষ্ট নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশ। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কথসাহিত্যের অভ্যন্তর থেকে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বিচিত্র পেশার মানুষগুলো এমন অবলীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘোষণা করেছে নিজেদের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য। এক কথায় স্বদেশের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন বলেই তাঁর শিল্প নির্মাণ সার্থক হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তাঁর মনশ্চেতনা থেকে কখনও হারিয়ে যায় নি। স্বদেশের প্রতি ভালবাসার জন্যই তাঁর ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শে পুষ্ট মননের গভীরতা থেকে তিনি তাঁর ছোটগল্পের শিল্পবলয়ে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনকে এমন

অপার মমতায় রূপ দেওয়ার প্রেরণা পান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের বই দুটি– ‘*নয়নচারা*’ (১৯৪৫), ‘*দুই তীর ও অন্যান্য গল্প*’ (১৯৬৫) এছাড়া অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছে বত্রিশটি গল্প রয়েছে।

‘নয়নচারা’র গল্পগুলোতে লেখকের মনোসমীক্ষণজাত শিল্পছাপই বেশি পড়েছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনের পরিচয় আছে। তবে সমাজ সেখানে প্রাধান্য পায়নি। সমাজকেন্দ্রিক মানবজীবন তাঁর উপলক্ষ, কিন্তু মানবজীবনের অন্তর্বিশ্লেষণ তাঁর লক্ষ্য।

মানবসত্তার অন্তর্বিশ্লেষণের বাইরে বাংলাদেশের জীবন ও পরিপার্শ্বকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে ওয়ালীউল্লাহর ‘নয়নচারা’ গল্পে। তাই লেখক অনুভব করেন, মনের গভীরে চিন্তার কীট যখন ঝাঁকে ঝাঁকে চলতে থাকে, তখন কালো রাতের জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাঘাটকে মনে হয় ময়ূরাক্ষী নদী কিংবা ফুটপাতে যখন নোংরা মানুষগুলো অবলীলায় শুয়ে থাকে তখন সে দৃশ্য তাঁর কাছে যেন একগাদা ছড়ানো খড়।

‘পরাজয়’ গল্পে নারীদেহের প্রতি পুরুষের দুর্দম কামনার বিষয় স্থান পেয়েছে। ‘মৃত্যু-যাত্রা’ গল্পে দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষেরা খাদ্যান্বেষণে যাত্রা করেছে। ‘খুনী’ গল্পের রাজ্জাক আলেকজান্ডার চরের সোনাভাঙা গ্রামের মৌলবী বাড়ির ছেলে। চর অঞ্চলের মানুষের রক্ত তার ধমনীতে বাহিত। একদিন সে এ চৈত্র মাসে ‘দুফর ওক্তে ফজু মিয়াগর বাড়ির মাইন্যার মাথা’ ফাটিয়ে দেশান্তরী হয় এবং দূরের কোনো এক অঞ্চলের এক দরজির মমতার ডোরে বাঁধা পড়ে। ‘পাগড়ী’ গল্পে খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের পুনর্বিবাহের কাহিনীটি উপলক্ষ, কিন্তু তাঁর অভিলক্ষ মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের পর্যালোচনা ও তার বিশ্লেষণ।

বাংলাদেশের সমাজ সমস্যা চিরদিনই শামসুদ্দীন আবুল কালামকে আন্দোলিত করেছে। এ সমাজ দুর্বল বলেই সবলেরা খুব সহজেই নিরন্ন অসহায়, দুর্বলের উপর অবলীলায় চিরাচরিত কায়দায় অত্যাচার চালিয়ে যায়। এ সমাজ সম্পর্কে লেখকের রয়েছে বিপুল অভিজ্ঞতা। তিনি তীব্র সমাজ সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ জীবনবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে বাংলার লাঞ্ছিত সমাজ জীবনকে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বাইরের দিকটিই তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর গল্পগুলো হল– ‘*পথ জানা নেই*’ (১৯৪৮), ‘*অনেক দিনে আশা*’ (১৯৪৯), ‘*ঢেউ*’

(১৯৫৩), ‘*দুই হৃদয়ের তীর*’ (১৯৫৫), ‘*জীবন-কাব্য*’ (১৯৬৩), ‘পুঁই *ডালিমের কাব্য*’ (১৯৯৪)।

‘জীবন কাব্য’ গল্পখানি মোট দশটি কিস্তিতে সমাপ্ত। জীবনের নানা বিষয় নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত। এর ‘পহেলা কিস্তিতে’ ফতেমা নামক এক কাজের মেয়ের জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ‘দ্বিতীয় কিস্তিতে’ এক সাংবাদিকের গ্লানিময় বিচিত্র জীবনের কথা বিবৃত হয়েছে। ‘পঞ্চম কিস্তিতে’ রাজু আর মিলির প্রণয়ঘটিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। ‘পুঁই ডালিমের কাব্য’ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ‘লাল বাত্তি’ গল্পে এক অসহায় দিনমজুর পরিবারের চিত্র বিবৃত করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি অন্তরের সহানুভূতি ও আন্তরিকতা থাকার দরুণই শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্প পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আরও একজন প্রবীণ গল্পকার আবু রুশদ জীবনকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। কিন্তু এই রোমান্টিকতার বাইরেও যে জীবনের নানা বাস্তব দিক রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। গল্পের ভেতরের চাইতে বহিরঙ্গের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবু রুশদ এর গল্পগ্রন্থগুলো হল– ‘*রাজধানীতে ঝড়*’ (১৯৩৮) ‘*প্রথম যৌবন*’ (১৯৪৮), ‘*শাড়ি বাড়ি গাড়ি*’ (১৯৬৩), ‘*মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার*’ (১৯৮৫), ‘*নির্বাচিত গল্প*’ (১৯৯০)।

‘*মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার*’ গ্রন্থের ‘বাখিল’ গল্পে মাহমুদ নামক এক ব্যক্তির জাত কিপটেমির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ‘নূড়ির মা’ গল্পে নূড়ির মায়ের সাধারণ জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক উপস্থাপন করেছেন। ‘নির্বাচিত গল্প’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভয়’ গল্পে সর্বদা ভয় পাওয়া শঙ্কাব্যাকুল মানবমনের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘মালাকাল মত্তত ও আম্মাজান’ গল্পে আম্মাজানের অনুভূতি দিয়ে মালাকাল মত্ততের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে জীবনের চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন। ‘শাড়ি বাড়ি গাড়ি’ গল্পে অর্থ আর প্রাচুর্যের আড়ালে সুখ কতখানি কার্যকর ভূমিকা পালন করে তারই একটি হিসেব পাওয়া যায়। ‘হাড়’ গল্পে ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সমকালীন একটি ঘটনাকে গল্পের কাহিনীরূপে গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মান্তিক একটি ব্যথাদীর্ণ ছবি অংকন করেছেন ‘খালাস’ গল্পে।

বাংলা সাহিত্যে আবু ইসহাক প্রধানত পল্লীর সমাজ ও জীবনের একজন দক্ষ রূপকার। সমাজ-বীক্ষণে তাঁর অভিনিবেশ তাঁকে সমাজের মানুষের জীবন প্রতিবেশ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে তবে তিনি প্রধানত শোষিত মানবাত্মার আর্তনাদে বেশি সাড়া দেন। ফলে তাঁর ছোটগল্পে সমাজের উপেক্ষিত জনেরা অবলীলায় বেরিয়ে আসে। কুসংস্কারের বদ্ধ আবহাওয়ায় লালিত জীর্ণ সমাজ-জীবনকে তিনি তাঁর সহানুভূতির রসে সিক্ত করে অভিব্যক্তি দিয়েছেন।

পল্লীর সমাজ জীবন ও পল্লীবাসীর নিকট সান্নিধ্যে, আবু ইসহাক তাঁর সাহিত্য জীবনের সহায়ক কিছু দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যা বাস্তবতার নিগূঢ় সম্পর্কে বাঁধা, যা কোনো ক্রমেই কল্পনা সর্বস্ব জীবনের রূপ নির্মাণে আগ্রহী নয়। সেজন্য আবু ইসহাকের গল্পের কোনো কোনো অংশ যেন আমাদের চারপাশের সমাজ ও জীবনের এক একটি আশ্চর্য বাস্তব ছবি বলে মনে হয়। যেমন-

> 'বেলা তখন এক প্রহর। হঠাৎ পূর্বদিকের বাড়িটায় হৈ চৈ শোনা যায়-নিলরে নিল-নিল-নিল। আবার মোরগ-মুরগীর আর্ত চীৎকারও শোনা যায়-কট্ কট্ কট্-কঅট্ কট্ কট্ কট্ কট্- ক অট্ ইউসুফ বুঝতে পারে পাতিশিয়ালে মোরগ নিয়ে পালাচ্ছে। সে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই দেখে তাঁর ক্ষেতের পাট দলেমলে কি যেন আসছে। অস্পষ্ট কাতরানি আর পাখার ঝটপটও শোনা যায়। পাতিশিয়াল তো তার দিকেই আসছে। ইউসুফ কাছা মেরে তৈরী হয়। তার কাছাকাছি আসতেই সে কাস্তে হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাতিশিয়াল মোরগ ফেলে পালিয়ে যায়। বড় একটা রাতা, মাটিতে কাত হয়ে পড়ে দাপাতে থাকে। গলা থেকে রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে।'[৮]

আবু ইসহাকের গল্পের বই দুটি '*হারেম*' (১৯৬২), '*মহাপতঙ্গ*' (১৯৬৩)।

'পাকনা শোশার ঝড়' বলে কথিত কলুবংশের সুন্দরী মেয়ে পরীবানুর সঙ্গে নলগছির মোড়ল বাড়ির ইয়াসিনের প্রথম অনুরাগ জন্মে। পরে প্রগাঢ় ভালবাসা নিয়ে ইয়াসিন পরীবানু প্রেমের নৌকায় পাল তুলে জীবনের অভিসারে বের হয়। কিন্তু সে অভিসারেও কাটা আছে। দুর্দান্ত আতাউল্লাহ খাঁ সুন্দরী পরীকে আত্মসাৎ করতে না পেরে একদিন সুযোগ বুঝে তার হিংস্র থাবার ঘায়ে দুজনকেই ঘায়েল করে। সেই দুষ্ট ক্ষণে আতাউল্লাহ পরীর গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা

করলে ইয়াসিন তার বৈঠাটানা মাচি কাঁটা পেশীবহুল শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রয়োজনবোধে দুর্বলের ইচ্ছেশক্তির কাছে প্রবল যে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়, ইয়াসিন একটি অসুরের কবল থেকে তার পত্নীকে রক্ষা করে তার প্রমাণ দেয়। জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতা আবু ইসহাককে বহুলভাবে আকর্ষণ করে। আর সে বাস্তবতাও পল্লীর অজ্ঞাতকুশলীদের জীবন-যন্ত্রণার বিষয় নিয়ে সজীবতা লাভ করে। লোকজীবনের ট্র্যাজিডির অন্যতম রূপায়ন তাঁর 'আবর্তক' শীর্ষক গল্প। এই গল্পে পল্লীর চাষী পরিবারের দুই যুবক যুবতীর প্রেমের বিষয়কে লেখক ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় বেঁধে রূপদান করেছেন। পল্লীর লোকজীবনের এই কাহিনীতে লেখক বিষাদময়তা সৃষ্টি করেছেন, স্বভাবতই তা জসীমউদ্দীনের আখ্যানমূলক কাব্য সোজন বাদিয়ার ঘাট কিংবা নক্সীকাঁথার মাঠের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পটি লেখকের এক চমৎকার রূপক চিন্তার অভিব্যক্তি। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ জমির মালিক কৃষক নয়, শহরে নগরে বাস করা বিত্তবান এক শ্রেণীর মহাজন, জমির চাষবাস কিন্তু করে ভূমিহীন চাষীরাই। কিন্তু জমির ফসলের একটা মোটা অংশই ভোগ করে মালিক। জোঁকের মতো রক্ত শোষণকারী মহাজনদের কৌশলগত শোষণের এই চিত্র তুলে ধরেছেন আবু ইসহাক তাঁর এই গল্পে। 'উত্তরণ' গল্পে লেখক এক দুধওয়ালার হতভাগ্য জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

আবু ইসহাক তাঁর ছোটগল্পে প্রধানত নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের পক্ষালম্বন করে সমাজ ও জীবনের ছবি অঙ্কন করেছেন। সেজন্য সমাজের আকস্মিক অপাংক্তেয়রা অসাধারণ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গল্পকার তথা কথাশিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। দেশভাগের আগেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন আল আজাদের পদসঞ্চারণ শুরু হয়। সমাজ, জীবন ও পরিবেশকে তির্যকভাবে দেখার প্রবণতাও তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী বিধৌত বাংলার বিশাল জনপদের যে বিচিত্র জীবনধারা, তার

সঙ্গে তাঁর কিশোর মনের পরিচয় তখন থেকেই শুরু হয়। তাঁর প্রথম গল্প 'জানোয়ার' চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক সওগাত পত্রিকার ছাপা হয়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম পর্বে বাংলার সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষের জীবনে বিরুদ্ধ পরিপার্শ্বের যে নির্মম ছোবল লক্ষ্য করেছেন, তাঁর সেই জীবন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ তাঁকে তখন নিশ্চিতভাবেই একজন সমাজমনস্ক শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পগ্রন্থগুলো হলো– '*জেগে আছি*' (১৯৫০), '*ধানকন্যা*' (১৯৫১), '*মৃগনাভি*' (১৯৫৩), '*অন্ধকারে সিঁড়ি*' (১৯৫৮), '*উজান তরঙ্গে*' (১৯৫৯), '*যখন সৈকত*' (১৯৬৭), '*আমার রক্ত*', '*আমার স্বপ্ন*' (১৯৭৫), '*জীবন জমিন*'।

'বৃষ্টি' আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কমজোর নারীর উপর গ্রামীন সমাজের অবিচারের একটি দিক উন্মোচন করে 'বৃষ্টির' কাহিনী শুরু হয়। মৌলনা মহীউদ্দিন বৃষ্টি না হওয়ার কারণ স্বরূপ বললেন, নারী যখন বেপর্দা হয়, কোনো মেয়ে যদি অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়, তখন আল্লাহ তার বান্দাদের উপর নাখোশ হন, পরিণতিতে বৃষ্টি বন্ধ হয়। সেদিন রাতে যখন গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে মৌলানা সাহেবের ফতোয়ার জোরে অসহায় বাতাসী ও ম্যালেরিয়ারক্লিষ্ট রহিমুদ্দিকে বিনা অপরাধে পঞ্চাশ ঘা জুতোর বাড়ি দিয়ে গ্রামছাড়া করার ব্যবস্থা করা হলো, তখন ঘটনার আর এক প্রান্তে খালেদ আর জোহরা মিলনের উন্মুক্ত রাগে আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবনের সুধাপানে মশগুল আর ওদিকে সমস্ত আকাশ জুড়ে-

'স্বর্গ-মর্ত পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ংকর সুন্দর রাগিনী।'[৯]

এই অসাধারণ গল্পটিতে আলাউদ্দিন আল আজাদ নরনারীর যৌনতার বিষয়টিকে চমৎকার এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়া গল্পটির পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে গ্রাম্য মৌলভীদের ফতোয়াবাজী ও ধর্ম নিয়ে জারিজুরি।

'পরী' গল্পে এক যুবতীর উপর এক বৃদ্ধের রিরংসা-বৃত্তি চরিতার্থের দুর্দমনীয় বাসনার রসালো একটি কাহিনী বিবৃতির প্রয়াস দেখা যায়। গ্রামের অপেক্ষাকৃত পয়সাওয়ালা ধেনু মোল্লার

নজর পড়ে নাতনীর বয়েসী পরীর উপর। লোভ দেখিয়ে পরীকে তার আয়ত্তে আনলেও ধেনু মোল্লা বুঝতে পারে সে অকোজো হয়ে পড়েছে। 'জমা খরচ' গল্পটিও সিলেটের চা বাগানের কুলি-কামিনদের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত। তবে এতে তাদের যৌনজীবনের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় মিরজা আবদুল হাই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ছাত্রাবস্থায় স্কুল ম্যাগাজিনে গল্পলিখে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটান। কিন্তু একজন ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা পঞ্চাশের দশকে। সমাজ সচেতনতা, তীক্ষ্ণ জীবনবোধ ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা তাঁকে একজন বিশিষ্ট গল্পকার রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ দুটো– '*ছায়া প্রচ্ছায়া*' (১৯৭৬) ও '*বিস্ফোরণ*' (১৯৭৮)।

'*ছায়া-প্রচ্ছায়া*' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মেহের জানের মা'। গ্রামের অসহায় ও নিরন্ন মানুষের প্রতি লেখকের ভালবাসা গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। দেশের আনাচে কানাচে বাস করা এইসব মানুষেরা সারাজীবনই উচুতলার মানুষের শিকার। 'শকুনি' গল্পে হাজীবিবি নামক এক বৃদ্ধের সংঘাতময় জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। '*বিস্ফোরণ*' গল্পগ্রন্থের 'ওরা মরে না' গল্পে অনাথ বিধবার একমাত্র অবলম্বন পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার ছবি কাহিনীকে বেদনাময় করে তুলেছে।

সৈয়দ শামসুল হক একজন নগরনমস্ক গল্পকার হিসেবে পরিচিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামজীবনও তাঁর গল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্পের বইগুলো হলো– 'শীতবিকেল' (১৯৫৯), 'রক্ত গোলাপ' (১৯৬৪), 'আনন্দের মৃত্যু' (১৯৬৭), 'প্রাচীন বংশের নিঃশ্ব সন্তান' (১৯৮২), 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' (১৯৯৫), 'প্রেমের গল্প' (১৯৯০)।

'*আনন্দের মৃত্যু*' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'কবি'র প্রধান পাত্র কবি আবদুর রব মুনশীর শিল্পীজীবনের করুণ পরিণতির কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। গ্রাম জীবনের গল্প হওয়া সত্ত্বেও এতে সমাজজীবন প্রাধান্য পায়নি। বরং ব্যক্তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনার এক চমৎকার ভাষ্যরূপ দান করেছেন লেখক এখানে। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সৃষ্টির যে রহস্যময়

খেলা তাই চিত্রিত হয়েছে ‘কালামাঝির চড়নদার’ গল্পটিতে। এ ধরণের গল্পের কাহিনী মানুষের স্বল্পায়ু জীবনকে এক নতুন চেতনায় অর্থবহ করে তোলে। ‘প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান’ গল্পে লেখক এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের সন্তানের জীবনের ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। ‘জালেশ্বরীর গল্পগুলোর’ প্রথম গল্প ‘ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে’ গল্পের কাহিনীটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ‘নেয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়’ গল্পটিতে গ্রাম্য পটভূমিতে ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী দেয়া একটি কাহিনী রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। আর এদেশের সভ্যতা গ্রামনির্ভর। গ্রামের সাধারণ রূপটি সাধারণ মানুষের চোখে যেভাবে স্নেহ, মমতা, ভালবাসায় ধরা দেয়, এমনটি আর কিছুতেই নয়। তাই মানুষ ভেদে দেশমাতৃকার ভালবাসার রূপটিও বিচিত্র। নাড়ীর যে টান বাঙালি অনুভব করে তার রক্তে, তার বীজও প্রোথিত আছে এদেশের গ্রামবাংলার মাটিতে। এই টান থেকেই এদেশের কবি, সাহিত্যিকেরা দেশাত্ববোধের কথাই প্রমাণ করে। দেশমাতৃকার কথাই তাঁদের সাহিত্যে শিল্পিত রেখায় চিত্রিত করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনাতেও আমরা সেকথাই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। বিভাগোত্তর সময়ের বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এই ধারাবাহিকতায় সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছোটগল্পে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের রূপায়ণ বিচার্য।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা ঃ

১. চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২/জুন ২০০৯

২. ঐ

৩. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-৪৭

৪. ঐ

৫. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-৮৪

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৮

৭. শওকত ওসমান, *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, ১ম সং, ঢাকা, পৌষভ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা-৭৬

৮. আবু ইসহাক, *মহাপতঙ্গ*, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬৩, ‘আবর্ত’, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯

৯. আলাউদ্দিন আল আজাদের *শ্রেষ্ঠ গল্প*, ১ম সং, ঢাকা ১৯৮৭, ‘বৃষ্টি’, পৃষ্ঠা-২৬

১০. বিস্তৃত পাঠের জন্য, ফজলুল হক সৈকত, *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*

১১. আহমদ কবির, *সরদার জয়েনউদ্‌দীন* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলা সাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২

তৃতীয় অধ্যায়

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে গ্রাম জীবনচিত্র

সাহিত্যে মানুষ, মানুষের চারপাশে পরিবেশ তথা সমাজ অনিবার্যভাবেই চলে আসে। অর্থাৎ সাহিত্য ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। লেখকের সাহিত্য কর্মেও আমরা এরই প্রকাশ দেখতে পাই। মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ, শৈল্পিক উপস্থাপন ও প্রকাশ-কৌশলের মধ্যে নিহিত থাকে সাহিত্যের সাফল্য। জীবন ও সমাজ রূপায়নের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের পরিধি বেশ বিস্তৃত। প্রতিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানব-মনের ও চিন্তা-চেতনার যে অভিঘাত সংঘটিত হয়, তার ওপর তীর্যকভাবে আলোকসম্পাত করে একজন কথাশিল্পী যে ছবি তুলে আনেন তা একাধারে মানুষের মনন এবং সমসমায়িক সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উঠে আসে।

সভ্যতার আরম্ভ থেকে গ্রামকে অবলম্বন করেই সমাজ বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন নির্দশন 'চর্যাপদে'ও গ্রাম-বাংলার নানা চিত্র উঠে এসেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন।

> 'যে ডোমনারী খেয়া পারাপার করে, সে 'কবড়ী লেই, বোড়ী ন লেই, সুচ্চড়ে পার করেই'– কড়ি নেয় না, কুড়ি নেয় না, স্বচ্ছন্দে পার করে দেয়- এতেই পদকর্তা ভারী খুশি হয়েছেন। কোনো এক দরিদ্রা গর্ভবতী নারীর উক্তি, 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে'– আমি আশাহীন, স্বামী ক্ষপণক সন্ন্যাসী। টিলায় যার বাস, সেই গৃহিণীটির বাড়িতে নিত্য অতিথি আসে, নির্দয় দস্যু সব লুট করে নিয়ে যায়, 'সোনা-রূপা মোর কিম্পি ণ থাকিউ'–সোনারুপা আমার কিছুই রইল না– ইত্যাদি বর্ণনায় দরিদ্র জীবনের কিছু কিছু বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। এ সমস্ত ছবি বাংলাদেশের পরিচিত দৃশ্য।'[১]

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশ নাম শুনতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে গ্রামের চারপাশের চাষের ক্ষেত, নদীভরা মাছ, পুকুর, গ্রামের ছোট ছোট ঘর বাড়ি, গ্রামের সহজ সরল মানুষের মুখ। চিরচেনা এই ছবিই বারে বারে উঠে এসেছে লেখকের সাহিত্যের খাতায়। গ্রাম বাংলার আবহমান ছবি সম্পর্কে অজয় রায় লিখেছেন-

> 'গ্রামের অবস্থাটা কিন্তু শহরের মত ছিল না। পল্লীজীবন ছিল সহজ-সরল। তাদের জীবনাদর্শও ছিল অনাড়ম্বর-শান্ত-সহজ। দরিদ্রতাও ছিল গ্রামে প্রকট। প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্যে এর

একাধিক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তাঁদের কামনা ছিল : 'বিষয়পতি লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ' ... কৃষকদের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা–নিজের ক্ষেত, গোয়াল ভরা গরু-আর রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তি। আজকের অবস্থার সাথে এই কামনার সাদৃশ্য ভাবতে গেলে অবাক লাগে।'[২]

আমাদের আলোচিত সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য মূলত পঞ্চাশ-ষাট সত্তরের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কথাসাহিত্যে গ্রামীণজীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই আমরা পর্যালোচনার চেষ্টা করব। এ সম্পর্কে ফজলুল হক সৈকত লিখেছেন :

'সরদার জয়েনউদ্‌দীন বেড়ে উঠেছেন গ্রামীণ সমাজের চৌহদ্দীতে। গ্রামের প্রতিবেশ আর সার্বিক অবয়ব তাঁর মানসিক প্রবৃদ্ধির সার্বক্ষণিক সঙ্গী। গ্রামের মানুষ, তাদের বিচিত্র জীবনাচার, সমস্যা, সমাধানের প্রক্রিয়া, কূটকৌশল, আশা-হতাশা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত বহুবিধ অনুভূতি আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাস্তবতার রসে তিনি লালিত। অতএব, তাঁর সৃষ্ট কাহিনীতে, চরিত্র রূপায়ণে যে গ্রামীণ জীবন–তা দূর থেকে কল্পনার চোখে দেখা কোনো কল্প-জীবন নয় ; অভিজ্ঞতার নির্যাসে গড়া সে এক বাস্তব জীবন।'[৩]

সরদার জয়েনউদ্‌দীন ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর শৈশব কেটেছে গ্রামে। গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়, জীবনের খুটিনাটি সুখদু:খ আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। এক কথায় এ জীবন থেকে যা কিছু তিনি গ্রহণ করেছেন তা একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর সাহিত্যে তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে তিনি তুলে ধরেছেন শক্তিমত্ত জমিদার শ্রেণীর শোষণ, কৃষক বা সাধারণ প্রজাদের অসহায়ত্ব, শেষে তাদের বিদ্রোহ, সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা, নারীর বিচিত্র জীবনাচরণ, নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের কদর্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর প্রতিবাদী আচরণের প্রকাশ ও প্রতিফলিত হয়েছে।

লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ '*নয়ানঢুলী*' (১৯৫২ইং, হেমন্ত ১৩৫৯)। এ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'করালী'। 'করালী' গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। জমিদারের পেয়াদাগিরি করে করালী। স্ত্রী জামেলাকে নিয়ে সুখের সংসার তার। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে বন্ধুর মত সম্পর্ক তাদের।

আর তাই জমিদার (হুজুরকে) কে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা, হাসি মস্করা করতেও দ্বিধা করে না করালী। বলে–

'আমাদের হুজুর খুব সুশ্রী, না বৌ ? কেমন তোমার মন ধরে না? ... মনে মনে তো ভাবছো অমন সোয়ামী পেলে বেশ হ'তো।'[৪]

স্ত্রী তার স্বভাবসুলভ লজ্জাবোধ নিয়ে নিজেকে আড়াল করে, অভিমান করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয় না। করালীর স্ত্রী জামেলাকে নিয়ে গ্রাম্য সালিশ (কমিটি) বসান গাঁয়ের প্রধান। মাতব্বর, পরামানিকদের নিয়ে। সবাই একমত এব্যাপার নিয়ে যে এর একটা বিহিত করা দরকার। গাঁয়ের সাধারণ মানুষের সাথে জমিদারের সম্বন্ধ খাজনা নিয়ে। অথচ জমিদারের এরূপ ফিরিঙ্গিয়ানা স্বভাবের দরুণ ঘরের মেয়ে বউ নিয়ে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এবার বিচার চায় তারা, করালীকে পরামর্শ দেয় সদরে গিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিতে।

পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও করালী দুর্বল স্বভাবের। নিজের স্ত্রীর প্রতি মমত্ববোধ ও আন্তরিকতায় ভরপুর সে। আবার অবিশ্বাসও কাজ করে। ভাবে–

'উঃ মেয়ে মানুষ কি কালকূটে সাপ, দেখতে খেলতে ও নাচতে কত মজার আর ভেতর ভরা কত বিষ ...।'[৫]

কেঁচোর মত মাটির নিচে মিশে যেতে ইচ্ছে করে তার। ভাবে বউ তার কোটে গিয়ে সাক্ষাৎ দিবে এতে মান ইজ্জত আরও যাবে, তাই মামলা ঠোকার বিষয়ে কিন্তু কিন্তু (দ্বিধা) করে সে।

গাঁয়ের আর এক জোয়ান মানিক বিশ্বাস। বুক ভরা সাহস নিয়ে এগিয়ে যায়। খাঁপুড়ার প্রজাদের প্রতিনিধি হিসেবে সে করালীকে মনে করে। দেশকে মা হিসেবে ভাবে। তার ভেতর রয়েছে দেশাত্ববোধ–

'তোর সাথে সাথে গাঁয়ের মায় .... দেশের জাত যায়, সে কথা গুনে দেখেছিস ?'[৬]

করালীর লজ্জা–

‘জোঁকের মাথায় লবন লাগালে যেমন হয়, ও তেমনি শরীরের মধ্যে, মাথা টেনে নিতে চায়, যাতে কেউ না দেখে। সরম-লজ্জায় কাচুমাচু করে করালী।’[৭]

এমনই এক গরম পরিবেশে নব্বুই বছরের বুড়ো উজির সরদার বৈঠকখানার কোনা থেকে কথা বলে ওঠে। একেবারেই উল্টো কথা বলেন তিনি, কারণ তিনি সেকেলে লোক। তাঁর বক্তব্য-

‘যার খামারে বাস কর তার সাথে গোঁয়ার্তুমি চলে না।’[৮]

সকলের কথার বিপরীত বক্তব্য তার। তিনি সেকেলে মানুষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, অভিজ্ঞ কাজেই তার বিবেচনা ফেলতেও পারে না কেউ কিন্তু চাপা স্বরে প্রতিবাদ জানাতে চায় অনেকে। উজির সরদার বলে যে জমিদারদের বংশগত স্বভাব এটা। জমিদারের দাদা, ছেলে-পুলে সবাই একই রকম। এটা কোন তাজ্জবের কথা নয়। এতে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চৌদ্দপুরষের জুলুম আর তারা সহ্য করতে রাজি নয়। সুদ সমেত তারা এর বিচার চায়।

মেহের আলী খোনকারের ব্যাটার বউ এর উদাহরণ দেয় সরদার। করালী মনোযোগ দিয়ে শোনে। উজির সরদারের ছেলে মজিরদ্দির কাথায় চুপ করে যায় উজির সরদার। ওরা ষড়যন্ত্র করতে থাকে গায়ের সকলকে জানাতে যে গাঁয়ের পেরধানের হুকুমে তারা এবার প্রতিশোধ নিবে। গায়ের সবাই জমিদারে কাচারিতে আগুন দিতে যায়। সাত-পাঁচ চিন্তা করে করালী। সে চলতে থাকে চিন্তায় বিভোর হয়ে, মঙ্গল-অমঙ্গল, ন্যায়-অন্যায় কত কথাই মনে পড়ে তার। অবশেষে সে স্থির করে মামলা নয়, জমিদার বাড়ির দিকেই যাবে সে জামেলাকে মুক্ত করে আনতে। জামেলাও হয়তো মুক্তির জন্য ছটফট করছে। আবার এও ভাবে যে যদি সে না আসে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রতিবাদের পথই বেছে নেয়। বুক চিতিয়ে বিদ্রোহ করে। ভাবে আর নয় এবার চুপ করে থাকবে না। সমালোচক আজহার ইসলামের মতে–

‘করালী’ তে সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর সমকালীন পল্লী অঞ্চলে হরহামেশা সংঘটিত তৎকালীন সামন্ত-দাপটের একটি মর্মান্তিক দিক উদঘাটন করেছেন।’[৯]

‘ভাবী’ গল্পটিও সংসার জয়েনউদ্‌দীনের গ্রামের পটভূমিতে রচিত একটি অসাধারণ গল্প। ‘ভাবী’ গল্পে প্রণয়ীকে পাবার জন্য প্রণয়িনীর গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সামাজিক অনুশাসন ও নৈতিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার জীবনকে কিভাবে বেদনাবিধুর করে তোলে তাই প্রাধান্য পেয়েছে। ‘বড় ছেলে নেয়াজ মহাম্মদের সঙ্গে বিয়ে হয় সোহাগীর। কিন্তু সংসারের যাবতীয় কাজের প্রতি স্বামীর অতিরিক্ত দায়িত্ববোধের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না।

> ‘অধিক রাতে নেয়াজ মহম্মদ বাড়ী ফিরিয়া নিঃশব্দে ঢাকা ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িত। কখনো কখনো তার চোখে পড়িয়াছে : বিছানার উপর সোহাগী পড়িয়া আছে যেন গাছ থেকে ছিঁড়িয়া আনিয়া ধূলায় ফেলিয়া দেওয়া এক আঁটী স্বর্ণ লতার ডগা। এসব নেয়াজ মহম্মদ ক্ষণিকের জন্য, শুধু মুহুর্তের জন্য ভাবিয়াছে। এ নিয়া, মেয়েদের এ সাজসজ্জা ছেনালীপনা ঢং নিয়া চিন্তা করার তার সময় কোথায়? সে সংসারী মানুষ।’[১০]

একদিকে স্ত্রীর প্রতি অবহেলা অন্যদিকে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ভালবাসা ও আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত সোহাগী একসময় দেবর নবীবক্সের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সোহাগীর সৌন্দর্য ও শখের প্রতি নবীবক্সের ছিল পূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ। নবীবক্স তার ভাবীর যাবতীয় সাধ ও আহ্লাদ পূর্ণ করতে সচেষ্ট ও উৎসাহী। কিন্তু কখন যে নবীবক্সকে সোহাগী স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু সে এ কথা বুঝতে পারে সামাজিক রীতিনীতির কাছে তার এ প্রণয়ঘটিত আবেগ অগ্রহণযোগ্য ও আপত্তিকর। তাই সে একসময় নবীবক্সের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক থেকে দূরে সরে আসে। ভাবীর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও নবীবক্স ব্যাপারটি মেনে নেয়। কিন্তু দেবরকে কেন্দ্র করে তার মন:সংকট দিনে দিনে তীব্রতর হতে থাকে। নবীবক্সকে বিয়ে দিয়ে সে সংসারে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে স্বচেষ্ট হয়। কিন্তু বিয়ে ঠিক হওয়ায় তার মনের বেদনা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। আর বিয়ের দিনে নবীবক্স সকলের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করে তখন সোহাগীর হৃদয় পূর্ণ হয় প্রেম ভালবাসাহীন জীবনের তীব্র হাহাকারে।

তাদের বাবা নেজামদ্দি সরকার ছিল ঘোর সংসারী লোক। যে গ্রামের মানুষের কাছে কাব্‌লি নেজামদ্দি নামে পরিচিত। কিপটেমি করে সে তার সংসারের অবস্থা ফিরিয়েছে। এমনকি মরবার সময় ডাক্তার পর্যন্ত ডাকেনি। তার মৃত্যুতে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের স্বভাবসুলভভাবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বড় ছেলে নেয়াজ মহাম্মদ বাপের প্রটোটাইপ চরিত্র। তার স্ত্রী সোহাগীও স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায় পরিপূর্ণ রমনী। যদিও সে স্বামী সোহাগ থেকে বঞ্চিত। স্ত্রীসুলভ দুর্বলতা তার মধ্যে রয়েছে আর তাই স্বামীর অবহেলা মেনে নিয়ে সে নিজের অজান্তেই আসক্ত হয় দেবর নবীবক্সের প্রতি। স্বাভাবিকভাবেই স্নেহ পরিবর্তিত হয় প্রণয়ে।

> 'কিন্তু নবীবক্সকে কেন্দ্র করে সোহাগীর মনঃসংকট দিনে দিনে তীব্রতর হতে থাকে। অবশেষে তার বিয়ের সম্মন্ধ স্থির হওয়ায় সোহাগীর সচেতন মনে প্রণয়কেন্দ্রিক সংকট থেকে উত্তরণজনিত স্বস্তি ফিরে এলেও তার অবচেতনে দেবরের প্রতি প্রগাঢ় অনুভব তীব্রতর হয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিয়ের পর নবীবক্সকে বিদায় দেয়ার পর তার হৃদয় পরিপূণ হয় প্রেম-ভালোবাসাহীন নিস্ফল জীবনের সুতীব্র হাহাকারে।'[১১]

আর এভাবেই সোহাগীর জীবন ব্যাথা যন্ত্রণায় জর্জরীত হয়ে অকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

'কানা ফকিরের ব্যাটা' সরদার জয়েনউদ্‌দীনের একটি অন্যরকম গল্প। পাড়া গাঁয়ের সাধারণ ঘটনা নিয়ে গল্পের আরম্ভ। কোলটুর বাবা তোরাপ বেপারী ছিল, মরিচ-পটলের সামান্য ব্যবসায়ী। তোরাপ বেপারীর সাথে কোলটুর মায়ের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর, নসিব মিঞার সাথে কোলটুর মায়ের নিকা হয়। নসিব মিঞা খুব খাতির করেই কোলটুর মাকে ঘরে আনে। কিন্তু এই যত্ন বেশিদিন স্থায়ী হয়না। তাদের অভাবের সংসারে নিত্তনৈমিত্তিক অশান্তি লেগেই থাকে।

> 'নসিব মিঞা চোখে কম দেখে বলে লোকে বলে কানা ফকির। বাপ বলতে কোলটুরও কেমন যেন লাগে, তাই ও তাকে ডাকেই না। আড়ালে আড়ালে কানা ফকিরই বলে। মায়ের নিকের পক্ষে স্বামী, তা'ছাড়া ভিক্ষে ক'রেই খায়, ডাকতে লজ্জা করে না!'[১২]

নসিব মিঞা কার্যত ভিক্ষা করে কিন্তু এই পেশাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সে সকলকে বলে যে সে পীরগিরি করে। মুরিদ বাড়ী গিয়ে সে তার সংসার চালায়। তবুও গ্রামে সে কানা ফকির হিসেবেই পরিচিত। সে রাগী, হিংসুটে, ভণ্ড ও খল। স্বামী ছাড়া অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই কোলটুর মা নসিব মিঞাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। একা একটা ছেলে নিয়ে মহিলা নসিব মিঞার মিষ্টি কথায় ভুলে যায়। দুনিয়া ও আখেরাতের দোহাই দিয়ে নসিব মিঞা তাকে পেতে সমর্থ হয়। কিন্তু সুখ শান্তি কোনটাই হয়না, মুখ ঝামটা, গালি, প্রথম পক্ষকে নিয়ে অসম্মানজনক কথা, মোটকথা বুকের ধন কোলটুকে যখন মারে তখন আর সে সহ্য করে না। সেও বিদ্রোহ করে ওঠে।

কোলটু বুঝতে পারে তাকে ভালবাসে একমাত্র তার মা। বাবা, নসিব মিঞা ছলে বলে কৌশলে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতেই অভ্যস্ত করতে আগ্রহী। কোলটু কিন্তু এটা বুঝতে পারে। সে কিছুতেই রাজি হয়না। একটা ছোট্ট ছেলের মধ্যেও একটা লজ্জাবোধ কাজ করে যখন গাঁয়ের ছেলেরা তাকে কানা ফকিরের ব্যাটা নামে ডাকে। হাজার অত্যাচার সহ্য করেও কিছুতেই তাকে ভিক্ষা করতে রাজি করানো সম্ভব হয়না। অবশেষে দু:খে যন্ত্রনায় কোলটু বাড়ি ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়।

একদিন এক ভদ্রলোক কোলটুকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে কাজ দিতে চাইলে, কোলটুর সৎ বাবার অভিজ্ঞতাই তাকে সাবধান করে দেয়। সে মনে করে ভদ্রলোক মানেই পীর, পীর মানেই ভিক্ষাবৃত্তি। এই পেশার প্রতি ঘৃণায় ছোট্ট শিশুটির মনও শিউরে ওঠে।

বিশিষ্ট সমালোচক আজহার ইসলাম 'কানা ফকিরের ব্যাটা' সর্ম্পকে লিখেছেন–

> 'বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকদের জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা 'কানা ফকিরের ব্যাটা' গল্পটি সরদার জয়েনউদ্‌দীনের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। জীবনকে দেখার এ এক নতুন দিক। এ জীবনের প্রতি লেখকের সহানুভূতির সঙ্গে পাঠকের সহানুভূতিও সমানভাবে উৎসারিত হয়। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের তীক্ষ্ণ জীবনবোধের এক চমৎকার পরিচয় রয়েছে 'কানা ফকিরের ব্যাটায়'।'[১৩]

'ফুলজান' গল্পটিও গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা। 'ফুলজান' গল্প সম্পর্কে সমালোচক ফজলুল হক সৈকত এর বক্তব্য–

> 'ফুলজান গল্পে গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন-কথা চিত্ররূপ লাভ করেছে। এ গল্পের নাম চরিত্র ফুলজান ঢেঁকিতে অন্যের ধান ভেঙ্গে জীবনযাপন করে। মানুষের শরীরতো এই ভালো এই মন্দ। এ বিষয়ে প্রকৃত অর্থে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু শরীরে সামান্য শৈথিল্য এলে, কাজে কোন মন্থরতা কিংবা স্থবিরতা সৃষ্টি হলে শ্রমিককে ভৎসনা করেন মনিব। এ নির্দশন এদেশের যথেষ্ট রয়েছে। মাতব্বর রশিদ মিয়ার কামুক দৃষ্টির তাড়না ফুলজানকে অতীষ্ট করে তোলে। দারিদ্র আর নিয়তির কষাঘাতে তার জীবন জর্জরিত।'[১৪]

মনিব গিন্নি মোড়ল বৌ এর মুখ থেকে বের হয় গালি-গালাজ। ফুলজান প্রথমে সমস্ত সহ্য করে। মোড়ল বৌ এর খারাপ কথাগুলো শুনতে শুনতেই সে অনেক অনেক আগের স্মৃতিতে নিজের অজান্তেই প্রবেশ করে। মনে পড়ে সুদূর অতীতের স্নেহ-আবেগ-ভালবাসা। মনে পড়ে বাবলুর দাদীর কথা। সে যখন প্রথম পোয়াতি, প্রথম স্বামীর যত্নের কথাতেও স্মৃতির পাতা ভরে ওঠে। নবীনগরের কবির মাস্টার ছিলেন একজন মানুষের মতই মানুষ। গাঁয়ের অসহায় মানুষের প্রতি ভালবাসা, দেশের প্রতি দেশাত্ববোধ আর ছিল ছেলে বাবলুকে নিয়ে তার আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন। সন্তান স্নেহে প্রতিটি বাবার মত সেও ছিল ভরপুর।

মোড়ল বৌ এর চিৎকারে নবীনগরের স্মৃতি চারণ খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায় ফুলজানের।

> 'যেন লাঠির আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো একটা কাঁচের বাসন।'[১৫]

ফুলজানের স্মৃতিতে আবার ভেসে ওঠে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ছবি। অসহায় মানুষের প্রতি নির্ভীক কবির মাস্টারের বিরামহীন, ক্লান্তিহীন সেবার কথা। এহেন কৃতজ্ঞতায় ভরপুর যে নারী তাকেই শুনতে হয় গ্রামাঞ্চলের নানা অপবাদ–

> 'লক্ষী ছান্নি- না হলে কি দুই দুটো সোয়ামী খায়' ?[১৬]

অপমান, দু:খ, জ্বালায় আবার সে পুরনো দিনে আশ্রয় নেয়। সেই বিয়াল্লিশ সনে নবীনগরের কবির মাষ্টারের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর পেটের দায়েই নিকে করতে হয়েছিল ছলিম সরদারকে। দ্বিতীয় স্বামী ছলিম সরদারের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তার আগের

ঘরের ছেলে বাবলুকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এরপর ছলিম সরদারের অত্যাচার অবিচারে তার ঘরেও টিকতে পারে না ফুলজান। ছলিম সরদারের মতো বিবেকহীন, মমত্বহীন মানুষের পরিচয়ও ফুলজান তার জীবন দিয়ে অনুভব করে।

মাতব্বর রশিদ মিয়ার লুব্ধ দৃষ্টি ফুলজানকে কুরে কুরে ব্যাথিত করে। এতসব অত্যাচার অবিচারের অমসৃণ পথ বেয়ে তাঁর জীবনের শেষ গন্তব্যস্থলে আসে সে। কিন্তু কখন এই পথ চলার সমাপ্তি তা সে জানে না। তাই দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া আর দশটা গ্রামের অসহায় মেয়ের মত জন্ম নেয়ার ঋণ তাকে নিরবে সহ্য করে যেতে হয়।

'কাজী মাষ্টার' গল্পে নারীকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা পিপাসু গ্রামপ্রধানের গ্রাম্য রাজনীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সমষ্টিগত মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল চিন্তা মূখ্য হয়ে উঠেছে। পরাণ মণ্ডল গ্রামের দরিদ্র কৃষক। তার বাপ-দাদার জমিও হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন তার একমাত্র ভরসা একমাত্র ছেলে তোমেজ ও মেয়ে ময়না। ময়নাই তার জমি হারাবার একমাত্র কারণ। দরিদ্রচাষী পরাণের কিশোরী মেয়ে ময়নাকে কেন্দ্র করেই গ্রাম প্রধান গণি মণ্ডলের সাথে তার সংঘাতের সূত্রপাত হয়। সমালোচক তাশরিক-ই-হাবিব লিখেছেন-

> 'গ্রামের বৈঠকে ময়নার পড়ালেখা বন্ধ করার জন্য গ্রাম প্রধানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় মাষ্টারকে লাঞ্ছিত হতে হয়। শুধু তাই নয় গণি মণ্ডলের নির্দেশে তার লোকজন পাঠশালাটি ধূলায় মিশিয়ে দেয়। তবে এ অপতৎপরতার মাধ্যমে গণি মণ্ডল গ্রামের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চাইলেও কাজী মাষ্টারের মতো আত্মত্যাগী-মহৎ চিত্তের মানুষরা সাধারণ মানুষের কল্যাণ্যের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'[১৭]

গ্রামের মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নেয় এই গণি মণ্ডল, সেই গ্রামের ও সমাজের কর্তা। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে তার ইমেজটা এমনই যে কোরান হাদিস যা ইচ্ছা বলতে পারে তিনি, এতে একচুলও ভুল হওয়ার উপায় নেই। এই বিদ্যাকে তিনি মোক্ষমভাবে রপ্ত করে নিয়েছেন নিজের সুবিধার্থে। সে ভণ্ড, খল, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা সমাজের সকলকে সে চোখ রাঙায় নারীলোভী এই গ্রাম প্রধান একদিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে গ্রামের পাঠশালায় ময়নার লেখাপড়া বন্ধের জন্য যুক্তি দেখায় যে, নারীদের লেখাপড়া ধর্মীয় দৃষ্টিতে কোরান-হাদিসের

বরখেলাপ। কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা দ্বারা সে কাজী মাষ্টারকেও অকাট মূর্খ হিসেবে প্রতিপন্ন করে। আবার অন্যদিকে সে গোপনে পরাণের কাছে ঘটক পাঠায় ময়নাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু পরাণ এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়। কারণ পরাণ নিজে অশিক্ষিত হলেও সে নিজের ভিতরে মেয়ে ময়নাকে শিক্ষা দেয়ার স্বপ্ন লালন করে। সে চায় ময়না পড়ালেখা করে নিজে চাকরি না করলেও একজন শিক্ষিত আধুনিক জামাই পাক। পরাণ মণ্ডল বুঝতে পারে অশিক্ষা মানেই অন্ধকার, অত্যাচার। তাই সে চায় তার সন্তানরা অন্তত এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুক। অন্ধকার থেকে আলোয় আসুক।

এক্ষেত্রে তাদের আলোর পথের দিশারী কাজী মাষ্টার। গ্রামের মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী কাজী মাষ্টার তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে পড়ালেখা চালিয়ে গেলে ময়না ভালো ফলাফল করতে এমনকি বৃত্তিও পেতে পারে। গ্রামের বৈঠকে ময়নার লেখাপড়া বন্ধ করার জন্য গ্রাম প্রধান তার সিদ্ধান্ত জানায়। এ সিদ্ধান্তের দ্বারাও গ্রামের বিচারব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চিরাচরিত ভাবেই গ্রামের বিচার তাদের পক্ষেই রায় দেয় যারা আর্থিক ভাবে অবস্থাপন্ন, গ্রামের মাতবর, জমিদার। যারা সাধারণ, অসহায়, অত্যাচারিত তাদের প্রতি এসব বিচার প্রতিনিয়তই নিষ্ঠুর। এবং যারা এসব বিচারের প্রতিবাদ করে, বিদ্রোহ করে তাদের কাজী মাষ্টারের মতই লাঞ্ছিত হতে হয়। শুধু তাই নয় গণি মণ্ডলের নির্দেশে তার লোকজন মাষ্টারের পাঠশালাটি ধূলায় মিশিয়ে দেয়। কিন্তু নতুন স্বপ্ন, নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহে, নতুন পাঠশালা নির্মাণের মাধ্যমে কাজী মাষ্টার গ্রামবাসীকে শিক্ষার আলোয় নতুন জীবন দান করতে আগ্রহী। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টিগত মানুষের কল্যাণ নিহিত বলেই লেখকের ইঙ্গিত মনোভাবনা তার নিম্নোক্ত সংলাপে ধ্বনিত হয়।

> ‘আত্মসুখই তো সুখ নয়, দেশের কয়টি লোক সুখে আছে? তাদের জীবনও তো জীবন। ... কিছু মানুষকে মানুষ বানাইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। সকালে মানুষ না হউক মানুষ হইবার পথ তো তৈয়ার হইবে।[১৮]

গাঁয়ের সামান্য দিনমজুর সবজান। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ঘরে এসে সামান্য খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে সে। সংসারের ছোটখাটো নানা সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুই জানার মতো আর অবস্থা থাকে না। এইভাবেই ‘সবজানের সংসার’ গল্পটির আরম্ভ।

গল্পটিতে সবজান ও তার স্বামী কেতাবদির ব্যর্থ সংসার জীবনের এক বেদনাদায়ক আখ্যান অঙ্কিত হয়েছে। তাদের একমাত্র সন্তান ছিল সোনা, সেও মৃত। মৃত সন্তানের স্মৃতি বুকে করেই তারা কোনো রকম বেঁচে আছে। গাঁয়ের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা, প্রতি-পত্তির জোরে সবজানের দিকে হাত বাড়ায়। সবজান প্রথম দিকে চুপ করে থাকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আর সম্ভব হয়না তখন কেতাবদিকে জানায় যে প্রেসিডেন্ট এবার নিজে বাড়ি বয়ে এসে সবজানকে অপমান করে যায়। কেতাবদিকে নিয়ে সে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু বাপ-দাদার পূর্ব পুরুষের ভিটা ছেড়ে দেশান্তরি হওয়া এত সহজ নয়–

> 'যাই কি করে সোনার মা, বাপ-দাদার ভিটের মায়া কি এত সোজা যে ইচেছ হলেই চলে যেতে পারি? একি পালের গাই না আমার মরা সোনা যে, ছাড় দিলি কি গোর কাটে মাটি চাপা দিয়ে দিলিই সব চুকে গেল? এযে আমার জ্যান্ত সোনা এর মায়া একদিনে কাটানো যায় না।'[১৯]

কেতাবদির এই বক্তব্যের দ্বারা তার সোনার মৃত্যুর ঘটনাটি যেন আবার উসকে ওঠে। দরিদ্র হলেও মায়া, মমতা পিতৃপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে তারা পরিপূর্ণ। প্রেসিডেন্টের কামলা কেতাবদির একার আয়ে সংসার চলে না তাই সে এরকম জোর করেই সে সবজানকে প্রেসিডেন্ডের বাড়িতে ধান ভানতে পাঠায়। তাদের দরিদ্রতার জন্যই প্রেসিডেন্টের কবল থেকে তারা কোনো ক্রমেই রেহাই পায় না।

নারীলোলুপ প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সবজানের নারীত্ব লাঞ্ছিত হওয়ায় কেতাবদির পৌরুষে আঘাত লাগে। তাই কেতাবদি করমালী ব্যাপারীর কাছে কামলা দিতে যায়। এদিকে প্রেসিডেন্ট জানে এসব অসহায় মানুষদের কীভাবে বিপদে ফেলা যায়। এসব প্রভাবশালী লোকদের পূর্ব পরিকল্পিত জাল বিছানোই থাকে। প্রেসিডেন্ট ভাবে-

> 'তিন সালের বাঁকী ট্যাকসো তোমার কাছে এখনো পাওনা, তাছাড়া দুই মন ধানের দাম আছে-এক বছর পরে সে সব সুদে আসলে উসুল করবো।'[২০]

এই দু:চরিত্র, অত্যাচারী প্রেসিডেন্টও সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে ভালো সাজবার জন্য ধর্ম-কর্ম করে। কিন্তু তার এই সব অপকর্মই ধরা পরে যায় একদিন। কেতাবদির মত সহজ সরল মানুষও বুঝতে পারে এই ধর্ম-কর্ম সবই জারি জুরি। সে ভাবে-

‘উঃ শালা শুয়াররে, মানষের জাত না। ... যাকাত দ্যাও, (গরীব দু:খীর দান খয়রাত কর্) হজ করে হাজী হইছো, আর গোপনে বদমাইসের চূড়ান্ত।’[২১]

গায়ের সাধারণ মানুষের সংস্কারও তার অত্যাচারের কাছে তুচ্ছ। আর তাই বিস্যুদবারের বার বেলাতে কেতাবদির দুধের গাইটাকে ক্রোক করে নিয়ে আসে। এ সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন কেতাবদি প্রতিবাদ করে তখন প্রেসিডেন্ট স্থানীয় দারোগার সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে কেতাদিকে মিথ্যে চুরির মামলায় জেলে পাঠায়। ছয়মাস জেল খেটে সংসারের এক নতুন রূপ কল্পনা করে কেতাবদি যখন অনেক দু:খ, কষ্ট, যন্ত্রণার অবসানের পর বাড়ি ফেরে তখন তার আপন ঘরটিকেই তার অপরিচিত মনে হয়। প্রচণ্ড এক ঝড়ে তার সংসারটি ভেঙ্গে গেছে। সে বুঝতে পারে প্রেসিডেন্টের লালসার বহ্নিতে পুড়ে সবজান তখন এক অন্য নারী।

তেতাল্লিশের মঞ্চন্তরের কিছু কিছু ঘটনা সে জেলেও শুনেছিল। সবজানেও আর কেতাবদির কাছে ফিরে যেতে চায় না। শুষ্ক মুখে কেতাবদি তখন শুধু বলল-‘আল্লা আমার মউত দ্যাও।’[১৯] অসহায় কেতাবদি যতবার প্রেসিডেন্টের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে ততবারই সে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তার তুলনায় বিরুদ্ধ শক্তিটি মোটেই হীন নয়। তাই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত কেতাবদির জন্য মনটা আমাদের ব্যথিত হয়। সমালোচক আজহার ইসলাম গল্পটি সম্পর্কে বলেছেন–

‘ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস করা চলে; কারো কারো মতে ভাগ্যকে নিজের সামর্থ্যে গড়ে নিতে হয়; কথাটি খুবই সত্য। কিন্তু দুর্ভ্যাগ্যকে কি পরিহাস করা যায়? সম্ভবত যায় না। তাই দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাসে সুন্দর সংসারটি যখন ছারখার হয়ে গেলো, তখন তাকে আমরা বোধ হয় আর পরিহাস করে উড়িয়ে দিতে পারিনে। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত কেতাবদির জন্য মনটা আমাদের করুণায় ভরে ওঠে।’[২২]

'নয়ানঢুলী' গল্পেও তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অসহায় মানুষের দুর্দশার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কদম ঘরামির ছেলে নয়ান যদিও একসময় ঘরবেধে জীবিকা নির্বাহ করেছে। পরে সে ভাগ্যের চক্রে ঢুলী হয়। ঢোল বাজিয়ে এবং ভাঙ্গা ডোল মেরামত করে অত:পর সে জীবন শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার পিছনে চলে। তার জীবনের বিপন্নতার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে গল্পের এ অংশে–

> 'জেল থেকে ফিরে এসে জড়িপোষ আর তার মাকে আর দেখতে পাই নাই। শুনেছিলাম ওরা নাকি মরে গেছে। নয়ানের গলা ধরে আসে তবুও বলতে চায় কত কথা, কত ইতিহাস যা ওর বুকভরা গাঁথা রয়েছে। আজো নয়ানের মনে আছে সব কথা, খুব ভালো করেই মনে আছে। ও বলেছিল পরামানিক তুমি মানুষ না, একটা পশু।'[২৩]

হারান প্রামাণিকের বাড়িতে ঘরামির কাজ করতে গিয়ে সে বাক্স ভর্তি টাকার সন্ধান পায়। অথচ প্রাপ্য মজুরী চাইতেই হারান জানায় তার কাছে টাকা নেই। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নয়ান অসুস্থ স্ত্রী, কন্যার চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়। শত অনুরোধে ডাক্তারও অর্থ ছাড়া তাদের চিকিৎসা করতে সম্মত হয় না। এমন এক অসহায় পরিস্থিতিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শীতেল চোরকে সঙ্গে নিয়ে হারানের বাড়িতে তাকে চুরি করতে হয়। ঘটনাটি জানাজানি হলে ছয়মাস কারাবাসের পর স্ত্রী কন্যাকে হারিয়ে সে ঢুলীবৃত্তি অবলম্বনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে।

নয়ানের এই যে চৌর্যবৃত্তি এ কিন্তু তার নিজের জন্য ছিল না। অসহায় স্ত্রী ও কন্যার জীবন বাঁচাতেই তাকে এই কাজ বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন আর আপন, নিজের বলতে কেউই রইল না তখন ঢুলী জীবন নিয়ে দরিদ্রতার সঙ্গে আপোষ করেই সে ছিল। জীবনের প্রতি কোনো অনুযোগ সে করেনি। চুরি করলেও সে ছিল সৎ। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার মত গরীব ঘরানির প্রতিবাদের ভাষাই ছিল এটা। কিন্তু এক সময় মন্বন্তর ও বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে দু-মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে শেষপর্যন্ত পচাইয়ের পরামর্শে রাতের আঁধারে সে কোনো এ দুষ্কর্মে বেরিয়ে পড়ে। তবে চুরিতে বের হওয়ার আগে সে আল্লাহর নাম নিয়ে বের হয়। কারণ সে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে পরিষ্কার। অস্তিত্বের সংকট এভাবেই তাকে জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পরিচালিত করে।

এছাড়া নয়ান ঢুলী তার কাজের প্রতি ছিল একনিষ্ঠ। আনন্দের সাথে কাজ করার কারণেই তার কাজ সর্বদা ভাল হয়। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধও তার মধ্যে দেখা যায়। আর তাই তার ওস্তাদের কাজের প্রশংসা করতে সে আনন্দ পায়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ '*বীরকণ্ঠীর বিয়ে*' (১৯৫৫ ইং ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) এ গল্পগ্রন্থের 'বাতাসী' সরদার জয়েনউদ্দীনের একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। মদিন গ্রামের খুবই দরিদ্র একজন মানুষ। তার স্ত্রী ফুলঝুরি এবং বাতাসী এই নিয়ে তার সংসার। বাতাসী একটা ঘুড়ী কিন্তু মদিন তাকে সংসারের একজন মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করে।

শুধু মানুষ হিসেবে বিবেচনাই নয়, গভীর এক ধরনের কৃতজ্ঞতাবোধ অনুভব করে মদিন বাতাসীর প্রতি। খেতে বসতে উঠতে বাতাসীর প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ পায়। বাতাসীর বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু এই বাতাসীই একসময় বয়সের আগে দৌড়াতো। এই কারণেই তার নাম হয়েছে বাতাসী। এখন তার আগের শক্তি আর সামর্থ্য অনেক কমে এসেছে। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মদিন সবই বোঝে, দরদভরা কণ্ঠে বলে, আর কিছুদিন পর তাকে পেনশন দেয়া হবে। তখন বাতাসী খাবে, দাবে, ঘুরবে আর আরাম করবে।

নিজে না খেয়েও মদিন বাতাসীকে আগে খেতে দেয়। বাতাসীকে নিয়ে মদিনের এত আদিখ্যেতা তার বৌ ফুলঝুড়ির পছন্দ হয়না। গরীবের সংসার, তারা নিজেরাই দুবেলা দু'মুঠো ঠিকমত খেতে পায়না। এরপর বুড়ি বাতাসীর প্রতি স্বামীর এই স্নেহ-মমতা ফুলঝুরির কাছে সহ্য হয় না। সে মদিনকে এই নিয়ে অনেক গঞ্জনা দেয়। গাঁয়ের অনেকে বাতাসীকে বিক্রি করে দেয়ার উপদেশ দেয়, যা মদিন গায়েও লাগায় না।

গঞ্জের হাট থেকে একদিন রাতে ফেরার পথে অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মদিন ও বাতাসী দুজনেই আহত হয়। ফুলঝুরির সেবায় মদিন ভালো হয়ে ওঠে। এবং সংসারের সামান্য যা কিছু তা সমস্ত বিক্রি করে মদিন বাতাসীর সেবা করে এবং বাতাসীও অল্পদিনের মধ্যে সেরে ওঠে। মদিন এবার সত্যিই বাতাসীকে পেনশন দিয়ে দেয়। বাতাসীও খেয়ে দেয়ে আরাম করে

ঝলমলে হয়ে ওঠে। মদিন স্বপ্ন দেখে আর ক'দিনের মধ্যেই বাতাসীকে হরিহরছত্র নিয়ে যাবে, সেখানে থেকে বাতাসী একটা বাচ্চা দিলেই আবার নতুন দিনের শুরু।

কিন্তু আর দশটা পাড়াগেঁয়ে ঘরের মত মদিনও জমিদারের বিষ চোখের বাইরে যেতে পারে না। খাজনার দায়ে পাষণ্ড জমিদারের নায়েব পাইক পেয়াদা দিয়ে একদিন বাতাসীকে ক্রোক করে নিয়ে যায়। যে বাতাসী ছিল মদিনের সুখ-দু:খের সাথি, কথাবলার সঙ্গী সেই বাতাসীর বিচ্ছেদে মদিনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়-

> 'বাতাসী ছুটিবার জন্য কেবলি ছটফট করিতেছে চিহিঁহিঁ করিয়া কেবলি কাঁদিতেছে। মদিন সেকথা শুনিয়া যেন, আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। গালে হাত দিয়া সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া কেবলি বাতাসীর দিকে তাকাইয়া রহিল। সে উহু কি আহা কিছুই কহিতে পারিল না। দুই গণ্ড বাহিয়া বেদনার ধারা তাহার দুই চোখ হইতে উবিয়া পড়িতে লাগিল।'[২৪]

সমালোচক আজাহার ইসলাম বলেন-

> 'মানুষের সাথে পশুর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট মানের গল্প লেখা হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরণী' একটি হাতির জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত। গোজাতির প্রতি মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক নিয়ে রচিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামধেনু'। এক স্নেহময়ী নারীর স্নেহমমতার ডোরে বাধাপড়া দুটি সাপের জীবনকথার মর্মান্তিক রূপায়ণ কাজী নজরুল ইসলামের 'পদ্ম-গোখরো'।'[২৫]

'বয়াতী' গল্পে পীর সম্প্রদায়ের তথাকথিত খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য প্রচারের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। গ্রামে প্রতিবছর জারিগানের আসর মাতানো মেহেরালী বয়াতীর পিতার অনুসরণে শিমুলতলীর পীরের প্রতি অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস প্রবল ছিল। পীরদের মানুষ ঠকানোর অপপ্রয়াস, অর্থলোলুপতা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে সচেতন মীরসাহেব তাকে অনুরোধ করেন গান রচনার মাধ্যমে পীর সম্প্রদায়ের ছদ্মবেশ উন্মোচন ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য। কারণ এ যুগের পীররা মূলত ধর্ম ব্যবসায়ী। ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান তাদের নেই বলেই ধর্মের নামে দোয়া-তাবিজ দরুদের ছলে অর্থ উপার্জনে

তারা যেমন মনোযোগী তেমনিভাবে মুখের কথাকে তারা শরিয়তের বিধান বলে চালায়। অবশেষে মীর সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হয় যেদিন রাতে জারিগানের আসরে 'পীর মুরিদের পালা'য় মুরিদের ভূমিকায় উত্তীর্ণ মেহেরালীর কণ্ঠে পীরদের বন্দনার পরিবর্তে মানবতার জয়গান উচ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার-আচরণ-রীতি-নীতি পীরের সেবা, ভক্তি ও শরীয়তের উর্ধ্বে উঠে সব মানুষকে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করাই সব ধর্মের মূলমন্ত্র। এ গল্পে লেখক মীর সাহেব ও মেহেরালী বয়াতীর মাধ্যমে সে বক্তব্যকেই উপস্থাপন করেছেন।

'ইজ্জত' গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূল্যবোধের অনুসারী জনৈক নওয়াবজাদা নিজামুল করিমের নারীর প্রতি নিছক কামাতুর ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহি:প্রকাশ ঘটলেও কিভবে নারী তার সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার মাধ্যমে আপন মহিমায় স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, সে বিষয়টিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রামের এক সহজ-সরল কিষাণবধূ সখিনার পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবন সুখে-দুখে কেটে যাচ্ছিল। তাদের সংসারে অভাব থাকলেও ভালবাসার পরিপূর্ণতা দিয়ে তারা তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। তাদের সরল ভালবাসা ছিল এমনটা কিষাণ সখিনাকে বলতো-

> 'বউ তুই আমার আশমানের চাঁদ, আর আমি মেঘ, তাই না?' [২৬]

আর সখিনা কিষাণকে বলতো-

> 'তুমি ভগবান ছিকেষ্ট, আর আমি জনম দুখিনী রাধা। তুমি কালো চক্ষের মনি, আর আমি সাদা ধুতরা ফুল।'[২৭]

সখিনাকে কিষাণ তার দুচোখের আড়াল হতে দিত না। কথার ছলে একদিন কিষাণ তার বউকে জানিয়েছিল যে সুন্দর হলে অনেক মুশকিল। নওয়াব, বাদশা, জমিদাররা সুন্দর মেয়ে দেখলেই তাদের ধরে নিয়ে যায়। অজ্ঞ, নিষ্পাপ সখিনা স্বামীর কথা বুঝতে পারে না। কিষাণ তাকে সবটাই বুঝিয়ে বলে। কিন্তু তারা জানে না অদৃষ্টে তাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে।

একদিন প্রতিবেশী সম্পর্কিত জনৈক খালার মিষ্টি কথায় ভুলে শহর দেখার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় সখিনা। জমিদার-নবাবদের ভোগস্পৃহা তৃপ্ত করতে সুন্দরী নারীদের অপহরণের কথা শুনলে তার প্রমাণ সে প্রত্যক্ষ করে নওয়াবজাদা নিজামুল করিমের লালসার শিকারে পরিণত হয়ে। অবশ্য সখিনা নিরীহ কুলবধূ হলেও নিজের ইজ্জত রক্ষার প্রেরণায় দাঁত দিয়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে পশুটাকে সেদিন ঘায়েল করেছে। যে খালার প্রতারণায় সে এরকম একটি বীভৎস ও অচিন্ত্যনীয় ঘটনার শিকার হয় সেই খালাকে অভিশম্পাত করে সে মনে মনে ভাবলো-

'এ ঘোর বিপদ থেকে যদি ছাড়া পাই খালা, তোমার কলেজা আমি চিবিয়ে খাব।'[২৮]

আত্মসম্ভ্রম রক্ষায় সক্ষম হলেও ঐ প্রাসাদের ধবধবে বিছানার দিকে তাকিয়ে সখিনার উপলব্ধি, তাতে নারীর প্রতি এ শ্রেণীর ভোগবাদী পুরুষের বর্বরতাই মূর্ত হয়ে ওঠে-

> 'এই বিছানায় কত শত অসহায় মেয়ের ইজ্জত লুট হয়ে গেছে অসুরগুলো বে দেল বে রহম হয়ে লোট পাঠ করেছে হাজার কুলবধূর কুলকে। ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা বিছানা, এক ধেয়ানে তাকিয়ে রইল সেদিকে সখিনা, ক্লান্ত চোখ টেনে নিয়ে ফিরে চাইলে দেয়ালের দিকে।'[২৯]

'গোলাপী সংসার' গল্পে গোলাপী নামের গ্রামের আরও এক কুলবধূর বিপন্নতার কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। গোলাপী, তার স্বামী নিজামতকে নিয়ে সংসার করছিল। ঝড়-বৃষ্টি-রোদে ভিজে নিজামত এক সময় শয্যা নেয়। তথাপিও গোলাপীর কোন অভিযোগ অনুযোগ ছিল না। স্ত্রীর প্রতি নিজামতের এক প্রকার মায়া ভালবাসা কাজ করেছিল। সে স্বপ্ন দেখতো তার শরীর সুস্থ হয়ে উঠলেই যে গোলাপীকে পেনশন দিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ, সমস্ত দায়িত্ব নিজে মাথা পেতে নিবে।

এভাবেই তাদের দিন কাটতে থাকে। কিন্তু বাধ সাধে গ্রামের সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির দৌরাত্ম্য, পাড়া-প্রতিবেশীর রটনা, স্বামীর অযৌক্তিক সংশয় ও সন্দেহের কুটিল বিষবাষ্পের স্রোতধারা। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার নানা অভিমান, ছোটখাটো ঝগড়ার ভিতর দিয়ে একরম চলতে থাকে। এমনি এক দিনে খুব সুন্দর এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় গোলাপী। গোলাপীর

এমন সুন্দর সন্তান হবে এ যেন মেনে নিতে পারেনা গ্রামের দশটা কুটিল মানুষ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাগে অভিমানে একদিন নিজামত গোলাপীকে প্রচুর মার-ধর করে। গোলাপী হাতে পায়ে ধরে স্বামীকে তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলে। সমাজ অভিজ্ঞ নারী গোলাপী স্বামীকে জানায় কাজ ছেড়ে-

'উপোস দিয়ে মলি সমাজের কেউ বন্দু হবিনা, চোখ ফেরায়া চায়াও দেখবিনা ?'[৩০]

নিজামত কিছুই বুঝতে চায় না। পরদিন সকালে নেজামত যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখন একা গোলাপী তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে নিদারুণ এক অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ নির্দয় সমাজ, সমাজের খল মানুষগুলোকে গোলাপী অনেক পূর্ব থেকেই চিনে। কারণ বহুদিন আগে গ্রামের ডাকসাইটে প্রধান হাজী ছেরামত সরকারের ছেলে মনসুর পণ্ডিতও যখন গোলাপীর রূপে আত্মহারা হয়ে গোলাপীকে ভালবাসার কথা শুনিয়েছিল, তখন গোলাপী সমস্তকিছুকে উপেক্ষা করে তার হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু কথা রাখেনি মনসুরও। অতীতের স্মৃতি যখন গোলপীর হৃদয়কে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয় তখন যেন গোলাপী কোয়েলাকে আরও অথিক ভালোবাসায় বুকে চেপে ধরে, আদর করে।

স্বামী পরিত্যাক্ত গোলাপীকে ভোগের জন্য গ্রামের প্রধান তাকে বিয়ে করে হজ্ব করিয়ে হাজিনী করার কথা বলে কিন্তু গোলাপী আর তার কথায় ভোলে না। সে সরাসরি জানায় যে হজ্ব করে সে বেহেশতে যেতে চায় না বরং স্বামী পথ বেয়ে কাষ্টের জীবন মাথায় নিয়ে যদি দোজখেও যেতে হয় তাতেও সে প্রস্তুত। গোলাপী সৃষ্টিকর্তার প্রতি আগে থেকেই বিরূপ কারণ অসহায় অত্যাচারিত অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর প্রতি সে জানিয়েছিল তার অসহায় আর্তনাদ-

'আল্লা তুই যে আছিস তার প্রমাণ কি এই ? এত কষ্টের খাটনি খাটন জেবন, তারপর আবার গৈর্দিশ তুই নাকি সুবিচের করিস? এই কি তোর সুবিচের ? সৎ পথে থামে কাম করে খায়া ও বাঁচতে দিতি চাসনে।'[৩১]

নারী হিসেবে অকারণে পরিবার ও সমাজে সে অশেষ নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করলেও মেয়ে কোয়েলাকে নিয়েই তার ভবিষ্যৎ ভাবনা কেন্দ্রীভূত। তাই সে চায় কোয়েলা লেখাপড়া

শিখে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, বাঁচার মত বাঁচুক। এজন্য গোলাপী মেয়েকে মনসুর পণ্ডিতের আশ্রয়ে রেখে গ্রাম প্রধানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিনের শোষণ-অত্যাচার প্রতিশোধ গ্রহণের দু:সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়। ক্রমাগত লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়ে বিপন্ন মানুষও যে একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তারই দৃষ্টান্ত এ গল্পের গোলাপী।

'কোয়েলা' গল্পের কোয়েলাও একটা সহজ সরল গাঁয়ের মেয়ে। নেচে, গেয়ে মায়ের আঁচলের নিচে ঘুরে বেড়িয়েই তার শৈশব কেটে গেছে। যৌবন যখন ছুই ছুই তখনই গল্পকার অতি তুচ্ছ গ্রামের সাধারণ বস্তুর উপমা দিয়ে লিখেছেন-

'তার গা ভরা যৌবন তাজা থকককে জালি লাউ ডগার মত থলথল করত।'[৩২]

কোয়েলার স্বভাবটাও ছিল প্রকৃতির মত স্নিগ্ধ, চঞ্চল-

'পচা পুকুরের তলায় ডুব দিয়ে শালুক উঠায়, আম গাছের আগায় উঠে ডুগডুগে লাল আমটি পাড়ে, গৃহস্থ বাড়ীর গোয়াল ঘরের চালে ঝুলানো ঝাঁকা থেকে কবুতরের বাচ্চা অনায়াসে ধরে আনে। সুযোগ পেলে ছেলেদের সাথে ডাংগুলি খেলায়, তা নিয়ে সময়ে অসময়ে ঝগড়া করে, এমনকি ঝগড়া গড়িয়ে মারপিট তক পৌঁছায়। মোটকথা কোয়েলা এমন ধরণের মেয়ে যার ভিতরে একটা পুরুষালী তেজস্বিতা আছে।'[৩৩]

তবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও খানিকটা মিলও আছে মা-মেয়ে দুজনেই লোকের কান কথা, লজ্জা, আব্রু, পর্দা এসব ব্যাপারে আমল দেয়নি। কিন্তু মায়ের মন, কোয়েলার এ ছটফটানি তার ভাল লাগে না। অজানা আশংকায় তার মন ভরে ওঠে।

গায়ের প্রধানের বাড়িতে জায়গীর থাকা এক মাষ্টার কোয়েলার রূপে আকৃষ্ট হয়। মাষ্টার কোয়েলাকে চাঁদ সুলতানার গল্প বলে। কোয়েলা বোঝে ইতিহাসের চাঁদ সুলতানা আর সে কিছুতেই এক হতে পারে না। চাঁদ সুলতানার গল্প তার মনে স্বপ্নের এক আবেশ তৈরী করে। গ্রাম প্রধানের গরু কোয়েলার শাকের গাছ খেয়ে ফেলায় রাখাল করিম ও তার মধ্যে মারপিট হয়ে যায়। পাড়ায় কয়েকটা দুষ্ট ছেলের সাথে এবার করিমও যুক্ত হয়ে কোয়েলাকে শিক্ষা দেয়ার

বুদ্ধি আঁটে। একদিন প্রায় সাঝের সময় কোয়েলা যখন ঘরের সন্ধ্যা প্রদীপটি জ্বালিয়ে নিজেকে পরিপাটি করতে ব্যস্ত তখনি একদল দস্যু তার সমস্ত কিছু অপহরণ করে পালিয়ে যায়।

কোয়েলার এই বিপদে একমাত্র এগিয়ে এসেছিল মাষ্টার। শিক্ষার আলোয় আলোকিত এই মাষ্টার সমাজকে নতুন করে দেখতে আগ্রহী। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সে চায় গায়ের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। তার মতে-

> 'ইজ্জত শুধু মেয়েদের একারই নয় ইজ্জত পুরুষেরও আছে।'[৩৪]

মাষ্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা কোয়েলার নেই, তার দু'চোখ বেয়ে বেরিয়ে আসে অশ্রু। কোয়েলার এই শারীরিক মানসিক বিপর্যয়ে প্রকৃতিও একাত্মতা ঘোষণা করে-

> 'নিস্তব্ধ বোশেখী দুপুর। খর রোদে পুরে পুরে তাপিত পৃথিবী যেন ঝিমুচ্ছে। পশ্চিম আকাশে একখন্ড গভীর কালো মেঘ দেখা দিয়েছে, মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। শ্রান্ত, দাহ ক্লান্ত পৃথিবীতে শান্তি নামবে।'[৩৫]

গ্রামের শালিসে বিচারের নামে মাতবররা আল্লাহর রসুলের দোহাই দিয়ে শুরু করে অবিচার। তারা জানায় এসব বেশরিয়তি কাজে মাফ নাই, শাস্তি কোয়েলাকে পেতেই হবে। এহেন বিপদাপন্ন অবস্থাতেও এগিয়ে আসে মাষ্টার। কোয়েলাকে বিয়ে করে সে যেন এই সমাজের প্রতি একরকম বিদ্রোহই ঘোষণা করে।

'নসিমন' গল্পটিতে নসিমন নামক একজন বারবনিতার জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পতিতালয় সমাজের নোংরা পুরুষদের আনন্দের একধরনের গোপন স্থান। প্রকাশ্যে তারাই এই সমাজকে ঘৃণা করে। তাদেরই আনন্দকে ধারণ করতে এসমস্ত পতিতাকে জীবনে চরম দু:খ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে বরণ করে নিতে হয়।

এই কাজে আসা নতুন মেয়েটি নাম নয়নতারা। রূপে যে সকলেরই নয়ন কেড়ে নেয়। তার সাথে এ লাইনে পুরাতন রাজুবালা, সৌদামিনী, কাজলীর মত আরো অনেক মেয়ে কাজ করে। তারাও নিজেদের মত, নয়নতারার পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়। অনেক কষ্টে তারা নয়নতারার আসল নাম ও তার জীবনের হৃদয় বিদারক কাহিনী জানতে পারে।

গ্রামের সহজ-সরল মেয়ে নসিমন (নয়নতারা) ভালোবাসে তার মামাতো ভাই রাজাকে। কিন্তু নসিমনের সৎমামা এ বিয়েতে রাজি হন না। তার ছেলে কারখানায় দুই কুড়ি টাকা মাইনের চাকুরি করে। তার জন্য লেখাপড়া জানা বউ চাই সঙ্গে গয়নাগাটি, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় এছাড়া সঙ্গে কিছু টাকাও মেয়ের বাপকে দিতে হবে। এ যেন গ্রামের পণ প্রথার এক মন্দ দৃষ্টান্ত।

আরও এক বাজে উদাহরণ নসিমনের বাবা। বাবা হয়েও সে নিজের মেয়েকে গলগ্রহ মনে করে ছমির মিয়ার মত মিস্ত্রীর ঘরে একমাত্র দুটো ভাল খেতে পাবার জন্য বিয়ে দেয়। নসিমনের সৎ মা তার একমাত্র দু:খের সাথী। তার সৎ মা হয়েও নিজের যন্ত্রণা-কষ্ট দিয়ে সে অনুভব করে নসিমনের বেদনা। কিন্তু ভাগ্যকে বরণ করে নসিমনকে ছমির মিয়ার ঘরেই যেতে হয়।

‘যাবার দিন নসিমন আমার থর থর করে কাঁপছিল জবাই করা মুরগীর বাচ্চার মত’[৩৬]

খবর পেয়ে রাজা দৌড়ে আসে। ফুপুর কাছে সমস্ত ঘটনা জেনে নসিমনের কাছে ক্ষমা চায় ও তাকে রাজার বাড়ি নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখান। কিন্তু তারপর দারুণ আঘাতে তার কপাল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। লজ্জা সরমে ফিরে যেতে পারে নাই স্বামীর ভিটায়। সমালোচক আজহার ইসলামের মতে-

‘আসলে সমাজের নির্মম পুরুষগুলোই নসিমনকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেয়, তাকে কলঙ্কিনী করে চিরদিনের জন্য ঘরছাড়া করে, পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করে।’[৩৭]

‘তালাক’ গল্পটির নূরজাহান চরিত্রটিও পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর বিধান ও মর্মান্তিক যাতনার শিকার। নূরজাহান আরবি পড়তে গিয়ে হাশেম মৌলভীর লালসার শিকার হয়। তিনবার বিবাহিত মৌলভী চতুর্থবার নূরজাহানকে বিয়ে করে। তের থেকে আরম্ভ হয়ে আজ পঁচিশ বছরে মোট দশটি সন্তানের জন্ম দেয় নূরজাহান। এত ঘন ঘন গর্ভধারণ করে নূরজাহানের-

'চাঁপার মত বরণটা কেমন যেন ফিকে সাদাটে হয়ে যাচ্ছে দিনের দিন। হাত পাগুলো, কাটা কঞ্চির মত চুপষে কাঠি কাঠি হয়ে গেছে। পেটটা বুক তক ঢিমলে মেরে উঁচু হয়ে উঠেছে। কেমন যেন- কিম্ভুত কিমাকার চেহারাটা।'[৩৮]

গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের শারীরিকভাবে অত্যাচারের আরো একধরনের রূপ এটি। মরণের কথাটা ভাবলেই পঁচিশ বছর বয়সের নূরজাহানের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

অথচ বাঁচার কোন পথই সে খুঁজে পায় না। প্রতিদিনই প্রায় উপবাস।

'ওষুধের নামে দেওয়া তাবিজ, বড় জোড় গোপাল ওঝার টোটকা টাটকি, নয়তো পীর সাহেবের ফুঁ ফাঁ। ওসবের নাম নূরজাহানের গায় আর সয় না।'[৩৯]

তাই এবারও যখন মৌলভী তার জন্য জাফরান দিয়ে লেখা তাবিজ এনে দিল। তখন নূরজাহান এবার তার অবিশ্বাসকে মৌলভীর সামনে প্রকাশ করে ফেলল। মৌলভী তোবা করে ধর্মের ভূল ব্যাখ্যা দ্বারা নূরজাহানকে বোঝাতে চায়-

'আল্লার নামে অশ্রদ্ধা জাহান্নামী, এর জন্যই তোর কষ্টের পারা পার নাই। ইন্তিকালের সময় মালুম হবে আজরাইলের জানটা কেমন করে কবজ করে। তারপর মুনকির নেকীর জীভটা টেনে পায়ের আঙুলে পেরেক ঠুকবে। বুঝবে মজা।'[৪০]

গ্রামের সহজ সরল, অশিক্ষিত মেয়ে হয়েও নূরজাহান নিজের জীবন দিয়ে শেখা যুক্তি দিয়ে বলে-

'হাজার ছেলাম আল্লার নামে, ওনাকে অশ্রদ্ধা আমি করি না। ঘেন্না ধরে গেছে তোমাদের ব্যবহারে। মনটা সব সময় ঘিন ঘিন করে।'[৪১]

হাশেম মৌলভীর কাছে সমস্ত যুক্তির শেষ আশ্রয় কোরান আর হাদিসে। রোজহাশরের ভয় দেখিয়ে সে প্রতিবারের মতো এবারও স্ত্রীর বিবেক, বুদ্ধি ব্যবহারকে বন্ধ করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নূরজাহান মৌলভীকে বলে রোজহাশর কেবল মাত্র তারই নয় মৌলভীর জন্যও আছে।

‘পরকে রোজহাশর ভেস্ত দোজখ এসব দেখিয়ে লাভটা কি, নিজের মনটাকে দেখাও না, দেখবে পাপ পূণ্য কোথায়?’[৪২]

মৌলভী এবার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করে। বলে-

‘আখেরাতে স্বামীর সুপারিশ ছাড়া চলবে না ?’[৪৩]

এত তর্ক-বিতর্কে নূরজাহানের মনের পড়ে বান্ধবী বাসন্তীর কথা। বাসন্তী তাকে সাবধান করেছিল মৌলভী সম্পর্কে। কিন্তু সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নূরজাহান কিছু বোঝার আগেই পাঁকে পা কেটে বসে থাকে। তখন আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু এবার হাজার সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও বাসন্তীকে চিঠি লিখে নূরজাহান। বাসন্তী এসেছিল। তার স্বামী বড় ডাক্তার। বাঁচার আঁশায় নূরজাহান বোস বাবু ডাক্তারের কাছে যেতে চাইলে, স্বামীর বাড়ি থেকে তার চিরবিদায় নিতে হয়।

‘জীবনচক্র’ সরদার জয়েনউদ্দীনের অন্য স্বাদের একটি গল্প। পঞ্চাশ বছর বয়সী দেরাজ খাঁ বহু কষ্টে সেপাই হতে জমাদার, জমাদার হতে থানার ছোটবাবু শেষে দোর্দণ্ড প্রতাপ বড় বাবু হতে পেরেছিল। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক ফজলুল হক সৈকত বলেছেন-

‘সরদার জয়েনউদ্দীনের “জীবন চক্র” তেমনি উত্থান-পতনের এক বাস্তব চিত্র। থানার দোর্দণ্ড প্রতাপ বড় বাবু দেরাজ খাঁ কালের চক্রে, জীবনের অমোঘ বিধানের ফলে হয়ে পড়ে কপর্দকহীন অসহায় মানুষ।’[৪৪]

সমাজের নিচু স্তরের লোক গগন মেরধা সেও দেরাজ খাঁর মান সম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলে, অপমান করে। অথচ এই গগন মেরধাই আজ বুদ্ধির জোরে দেরাজ খাঁর টাকা খেয়ে, চুরি করে অর্থের জোরে সমাজের উচু স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অনেক জমি, সহায় সম্পত্তি সবই হয়েছিল, অভাব ছিল না দেরাজ খাঁর। অভাব ছিল শুধু সংসার বুদ্ধির। সংসার বুদ্ধির অভাবের কারণেরই তার সমস্ত ধন-সম্পদ প্রবল প্রতাপ মান সম্মান ধুলায় লুটায়, দেরাজ খাঁর অবস্থা আজ সত্যিই সঙ্গিন।

'আজ তিন চার দিন ঘরে খাবার নাই, সোমও মেয়ে ঘাড়ে তাও আবার অন্ধ। মেজো ছেলেটির স্কুলের বেতন না দেওয়ায় নাম কাটা গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যখন ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদে তখন দেরাজ খাঁকে যেন অসংখ্য কালসাপে দংশন করতে থাকে।'[৪৫]

দেরাজ খাঁর ছেলে নবাব আলী আদরে আহ্লাদে মানুষ। অভাব অভিযোগ কাকে বলে সে তা জানে না। দশটা স্কুলের বিদ্যাবুদ্ধি পেটে গেলেও নবাব আলী নবম শ্রেণী উতরাইতে পারেনি। ফলে সে চাকুরিও পায়নি, লাঙল ধরা শেখেনি। ঘুষের মামলায় দেরাজ খাঁর চাকরি যাওয়ার পর থেকেই দুই বছরের কমলা ইন্ডাস্ট্রিয়েল, সাতগাঁ ব্যাঙ্ক, অবশেষে ডুবে গেছে মহাজন ব্যাঙ্ক।

সতেরো বছরের নবাব আলী বোঝে যে অভাব আর পাকস্থলীর মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলছে। তার হৃদয় দু:খ আর কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সে ধান কাটতে যেতে চায়। ক্ষুধার জ্বালায় নবাব আলী বুঝতে পারে না খেয়ে মরার চাইতে নিছক কুলীনতার মান সম্মান বড় জিনিস নয়। কিন্তু দেরাজ খাঁর বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। তবুও নবাব আলীর কথা তাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

নবাব আলী অবশেষে ধান কেটে ফিরেছিল মাথায় ধান আর গা ভরা জ্বর নিয়ে। ঔষুধের অভাব নবাব আর তার মাকে অপ্রস্তুত করে দেয়। নবাব জয়নুল আবেদীনের বিয়াল্লিশের নির্যাতিত মানুষের ছবি দেখে নিজের বেদনাকে ভুলতে চায়। টাকা, পয়সা, বুদ্ধির জোরে গগন মেরধা এখন সমাজের মানি লোক। দারোগার বাড়ির জমি তার দরকার। তাই সে নানা রকম বুদ্ধি আটে। থানায় যেয়ে মামলা করে আসে, দেরাজ খাঁ দিন দুপুরে তার গাছের কাঁঠাল চুরি করেছে। সারা গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে পড়ায় বাপ দাদার বংশের চুরির অপবাদে দেরাজ খাঁর হৃদয় অন্তর্জ্বলনে পুড়তে লাগলো। ঠিক এমন অবস্থায় নবাব আলীকে পানি দিতে গিয়ে পানির কলসী ভেঙ্গে ফেলায় মেয়ে জরীনকে দেরাজ খাঁ থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। এতেও তার হৃদয় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। অস্পষ্ট ভোগানির শব্দে দেরাজ খাঁর সম্বিত ফিরে আসে। দেখে রান্না করার ছাউনির নিচে শুয়ে তার স্ত্রী সন্তান প্রসবের যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

এমনই এক ভয়াবহ দৃশ্যের কঠোরতম বিভীষিকাময় এক ঘটনা তার মনের পর্দায় জ্যান্ত হয়ে ভেসে উঠে। মনে পড়ে সে ১৯৪২ সাল। পাঁচই আষাঢ়, ঝমঝম বৃষ্টি। তখন সে আটঘড়িয়া থানার বড় সাহেব। দেরাজ খাঁ এর মত ঠিক এরূপ এক বিপদেই পড়েছিল মেনাজ সেখ। অনেক হাতে পায়ে ধরে সে দারোগা বাবুর কাছে প্রমাণ করতে চায় যে সে নির্দোষ। মিথ্যে সাক্ষী না দেয়ায় তার চাকরি গিয়েছিল। সেদিন মেনাজ সেখের ছেলেরও জ্বর ছিল আর বউ ছিল গর্ভবতী। তথাপিও দারোগা বাবু মেনাজ শেখকে থানায় চালান করে দেয় আর মুখে বলে এ চাকরি বড় কঠিন হৃদয় পাষাণ করতে হয়। আজ মনে পড়ে মেনাজ শেখ সত্যিই নির্দোষ ছিল। ঠিক তখনই জরী বাবার কাছে দৌড়ে আসে, খবর দেয় তাদের বাড়ি পুলিশ এসেছে। দেরাজ খাঁ বুঝতে পারে এ তার কর্মফল। জরীর ডাকে তার কোনো বিকার হয়না।

> ‘শুধু আকাশের দিকে মাথা তুলে চায়। দৃষ্টি উদাস মন তার অসীম সেখানে শূণ্যতা ভয় নাই, ভাবনা নাই, মায়া মোহ মমতা আজ সেখানে কিছুই নাই। বড় নির্বিকার।’[৪৬]

এখানে লেখকের সমাজ সংলগ্নতা আর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

‘উজান বাঁক’ গল্পে গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের করুণ-কঠিন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জেলেদের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটির শুরুতে-

> ‘আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পদ্মায় মাছ ধরার সময় এটা। এখন থেকে আশ্বিনের শেষ সময় পর্যন্ত মাছ ধরবার মওসুম। জাল, নৌকা, বাসন-কোসন, সব ঘষে মেজে গাব দিয়ে ঝক মক করে তুলছে সবাই। বাড়ীর বড় এয়ো বউ, কি কুমারী মেয়ে এসে নৌকার মাথায়, পাশে, পিছে, আলপনার বাহার দিয়ে একটা লক্ষ্মীমন্ত করে তুলেছে। একটা হই-হুল্লোড় সার সার রব চারিদিকে।’[৪৭]

নাগরবাসী দরিদ্র জেলে। গত বছর মাছ তেমন মারা পড়েনি। তার পরও ছয়/সাত মাস ঘরে ভাত ছিল। তারপর দেনা-দাইক, চুরি-চামারি করে বছরটা একরকম ভালই কেটেছে। এরমধ্যে তিন মাস সে জেলেই ছিল, খাবার অভাব হয়নি। জীবনের কাছে তাদের মত মানুষের এতটাই ক্ষুদ্র চাহিদা, এতেই তারা আনন্দিত খুশি। এবার তার মাছ ধরতে যাওয়াটা অনিশ্চিত। গতবার ছেবাশের নৌকা সে বিক্রি করে দিয়েছিল, কিন্তু সকলকে বলেছিল পদ্মা মা তার ক্ষুধায়

নৌকাটা গ্রাস করে নিয়েছে। তার এই কথা প্রায় কেউই বিশ্বাস করেনি। আর তাই এবার আর কেউ তাকে মাছ ধরতে যাবার জন্য নৌকা দিতে চায় না।

তাই নাগর এবার শ্রীনাথের কাছে যায়। শ্রীনাথ এ অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার দোকান আছে, ধর্ম-কর্মেও সে পাঁকা লোক। এ পাড়ায় বিশ পঁচিশ ঘর জেলে আর দু চার ঘর পিরেনী তলার গাঁ। শ্রীনাথ এ এলাকার মানুষ নয়, তার জগতও ভিন্ন কিন্তু জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও তার মধ্যে আমরা আধাত্মিকতা দেখতে পাই-

> 'গরীবের আবার জাত কি, গরীবরা তো সব এক জাতেরি। তাছাড়া যিনি এ বোম্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা তার কাছে কি জাতের বিচের আছে? না তা নাই। মরার পর তোমারও কাঠের খান্ডন জুটেনা আমারও তাই। আর সংসারে উপেষ তোমার আমার সমান ভাবেই চলছে।'[৪৮]

মাঝে আর তিনটি দিন পরেই যাত্রা। অথচ নাগরের যাত্রা তখনও নিশ্চিত নয় কারণ তখনও কেউ তাকে নৌকা দিতে রাজি নয়। অনেকেই নাগরকে নৌকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু এখন সবাই অস্বীকার করছে। নাগরবাসী শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে এই ভেবে যে তাহলে কি সে এবার উজান বাঁকে যেতে পারবে না? গাঁজার কল্কিতে আগুন দিয়ে সে পুরনো স্মৃতির আবেগময় কল্পনায় বিভোর হয়ে যায়-

> 'উজান বাঁকে জাল বাওয়া, আষাঢ়ে নদীর খলবলে পানি টকাটক মাছ ধরা, সেসব পুরানো উজান বাঁকের স্মৃতি তাকে যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো।'[৪৯]

নাগরের আপনার এ সংসারে কেউই নেই। উজান বাঁকের ভোলার মার কথাও তার মনে পরে। তার অনিশ্চিত জীবনের একমাত্র সুখ সরোবালা। সরোবালাও নতুন জীবনের পথে পা বাড়াবার কথা বলেছিল। কিন্তু নাগর রাজি হতে পারে নি। দেশের কথা মনে করে মনটা কেমন কেঁদে আকুল হয়েছিল।

নিজের গাঁ, গাঁয়ের মানুষ, ভাঙ্গা বাড়ি সবকিছুর জন্যই নাগরবাসীর এক অদ্ভুত মমতা, ভালবাসা রয়েছে। এ কারণেই সমস্ত কিছুর বিনিময়ে সে ফিরে এসেছে তার পিতৃপুরুষের ভিটায়, কিন্তু এত ভালবাসার বিনিময়ে সে পেয়েছে কেবল ঘৃণা, অবিশ্বাস তাই সে এবার বিদ্রোহ করে

উঠে, প্রতিবাদী হয়ে উঠে। হরবোলাকে নিয়ে সে উজান বাঁকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ পর্যন্ত তারিনী খুড়োর নৌকা নিয়ে তারা উজানের পথে পা বাড়ায়। ঘোর অমাবস্যা। চারদিকে অন্ধকার। প্রকৃতিও যখন তাদের সহায় হয় না, তখনই তারা তাদের ভোলানাথ, মহেশকে স্মরণ করে বেড়িয়ে পড়ে।

'বীরকণ্ঠীর বিয়ে' গল্পে গ্রামে বাল্যবিবাহ রীতির সংকট, যৌতুক প্রথার দু:সহ বেদনা এবং চৌদ্দ বছর বয়সী এক যুবতী বীরকণ্ঠীর সুখ স্বপ্নভঙ্গের বেদনাজনিত করুণ পরিণতি অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে। চৌদ্দ বছরের বীরকণ্ঠীর বিয়ের জন্য এলামদি ও তার স্ত্রীর উদ্বেগের অন্ত নেই। পাড়া গাঁ এর মেয়েদের এগারো থেকেই বিয়ে দেয়ার ধুম পড়ে যায়। এক্ষেত্রে বীরকণ্ঠীর বয়স চৌদ্দ। বীরকণ্ঠী ও এলামদি, কন্যা ও পিতা সমাজের অপমান ও লজ্জায় একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। এছাড়া অভাবও তাদেরকে চারিদিকে দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

> 'এই শরীরের আবরু আর পেটের ভাত এ কুলাতেই জীবনটা হিমশিম খেয়ে গেল, বাড়ীর আব্রুর কথা কল্পনাই করতে পারে নাই'[৫০]

এমন চরম অবস্থায় এলামদি একদিন-

> 'বাদামতলীর কাসেম আলী মণ্ডলের ছেলে সাহেব আলীর সাথেই মেয়ে বিয়ে ঠিক করে।'[৫১]

কিছু যৌতুক সঙ্গে দিতে হবে।

আস্তে আস্তে বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। বীরকণ্ঠীও বিয়ের কন্যাসুলভ লজ্জায় রাঙা হয়, নানা কল্পনায় পরিপূর্ণ হয় তার দিন–

> 'লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল বীরকণ্ঠীর মুখ চোখ। মাঝে মাঝে পিছনের দরজার দিকে ফিরে চায়। আবার বনের বেড়াটার মাঝ দিয়ে দৃষ্টি দেয়। হেলে দুলে সড়ক বেয়ে সাহেব আলী চলছে। কাজল কাল বরণ। চিকন গড়ন সুন্দর মনভোলানো চেহারা যতদূর দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় বীরকণ্ঠী এক ধেয়ানে দেখলো ওই হবে বীরকণ্ঠীর স্বামী। ওকে নিয়েই জীবনভর ঘর করতে হবে বীরকণ্ঠীর। মন্দ কি বেশতো। বীরকণ্ঠীর ভালই লাগে।'[৫২]

কিন্তু বিয়ের দিনে গহনা দেখে ছেলের বাপ একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলো, বললো দেবনা তোর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। বীরকণ্ঠীর স্বপ্ন-কল্পনা এক নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় যৌতুককে কেন্দ্র করে পাত্রপক্ষ-পাত্রীপক্ষের মত-বিভেদে। অবশেষে পাত্রপক্ষ বিয়ের আসর পরিত্যাগ করায় অভিমানী বীরকণ্ঠীর ভবিষ্যতের রঙিন জীবনের স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতায় বেদনার প্রাবল্যে অকালে মৃত্যুরে দুয়ারে নিজেকে সমর্পন করে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *'খরস্রোত'* (১৯৫৫ ইং, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। এ গ্রন্থের 'উপকথা' গল্পে ইংরেজ সরকার দ্বারা তৈরী হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো কুপ্রথা বাস্তবায়নের হঠকারিতায় কৃষক শ্রেণীর সর্বস্বান্ত হওয়ার মর্মন্তুদ দিকটি রূপায়িত হয়েছে। এ গল্পের বর্ণিত অঞ্চলটির নাম দুলাই পরগণা। এই দুলাই পরগণাবাসীর করুণ বেদনা, যারা বংশপরম্পরায় প্রাপ্য নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এক জমিদার থেকে আরেক জমিদার ক্ষমতায় এলেও তাদের দুর্ভাগ্যের অমানিশা কোনোকালেই শেষ হয়না। গল্পটি সম্পর্কে আজহার ইসলাম বলেন-

> 'তৎকালীন সামন্ত অত্যাচারের একটা বাস্তবঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এই গল্পটিতে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের এই ধারার গল্পগুলোতে জমিদার প্রজার মধ্যে সংঘটিত অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার সন্ধান মেলে।'[৫৩]

উপকথার প্রধান পাত্র বুড়ো ওসমান খাঁ। ঢোলের শব্দ শুনতেই অস্থির হয়ে পড়ে। চাঙা হয়ে ওঠে তার রক্ত। জীবনের নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা তার স্মৃতিতে আকুলি বিকুলি করে। তার স্মৃতিতে কিলবিল করে বেড়ায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগের দুধর্ষ জীবনের বিবিধ ঘটনা। গাঁয়ের চাষীদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে একদিন সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চৌধুরীদের পাইক পেয়াদা ও লাঠিয়ালদের উপর। মা-বোনের ইজ্জত যাতে আর লুঠ না হয়, তার প্রতিকারের জন্য ওসমান খাঁ গাঁয়ের চাষীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। নওয়াব আলী শেখের বিধবা মেয়ে পরীবানু ওসমান খাঁকে ভালবাসতো। তাকে নিয়ে অন্যদেশে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ওসমান খাঁর ব্যক্তি জীবনের ভালবাসার চাইতেও দেশের প্রতি ভালবাসা ছিল প্রবল। আর ছিল কৃতজ্ঞতাবোধ। তাই তার কণ্ঠে শোনা যায়-

‘সে হয়না পরী, তোমার আব্বার পাহাড়ের মত বিরাট মান সম্মান ভেঙে গুড়িয়ে যাবে, সে, সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না সে জবাব দিয়েছিল ওসমান খাঁ। সে আর ও বলেছিল তোমার জন্য আমি জানও দিতে পারি, কিন্তু তোমার বাবার মানটা যে আমার জানের চাইতে অনেক দামী, সে যে আমার ওস্তাদ।’[৫৪]

নওয়াব আলীর মৃতুর পর সেদিন পরীবানু পাষানের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনটিকে ওসমান ভুলতে পারেনি। পরীবানুই ওসমান খাঁকে একদিন অনুরোধ করেছিল প্রয়োজন হলে জমিদারের খাজনা সবাই মিলে বন্ধ করে দাও। তারপর খাজনা বন্ধ করে দেয়া হলো, জমিদারের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই হলো। তারপর একদিন অনেক স্মৃতি বুকে করে নিয়ে ওসমান খাঁ মারা গেল।

লেখক যে নির্মম সত্যকে এ গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন, তা হলো জমিদারের নিস্পেষণে বিপর্যস্ত, উৎপীড়িত জনতা জমিদারকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে অক্ষম। কারণ মানুষ যে স্বার্থ-শক্তি-ক্ষমতায় মোহে মানবিক আবেগ-অনুভূতি-বিবেচনাবোধ হারিয়ে এমন বর্বর আচরণ করতে পারে, তা ছিল তাদের ধারণাতীত। তবে দুলাই পরগনাবাসী দু:স্বপ্নের ঘোর অন্ধকার রজনী পেরিয়ে ভবিষ্যতের নতুন সূর্যের আলোয় তাদের জীবনকে আলোকিত করবে, এমন আশাবাদের মধ্য দিয়েই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

‘পাষাণ’ গল্পে বিপত্নীক করমালীর জীবনের মর্মন্তদ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। বিপত্নীক হওয়ার পর নয়টি বছর এক মাতৃস্থানীয় খালার সাহায্যে কেটে যায়। খালা এবং করমালী দু’জন ভবিষ্যতে মনতাজ আলী, করমালীর ছেলের উপর নির্ভর করে। তাদের আশা, আর কয়েক বছর, মনতাজ আলীর বিয়ের পর, নাতবউ এসে সংসারের দায়িত্ব নেবে। খালার কষ্ট দূর হবে। করমালীর মাথা থেকে দায়িত্বের বোঝা নামবে। কিন্তু হঠাৎই একদিন খালা বুড়ী মুখ ভ্যাংচাইয়া চিরদিনের মতো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

করমালী এবার সত্যিই চারদিকে আঁধার দেখল। তারপর একদিন অনেক খোঁজাখুজির পর আজিরন বেওয়াকে বিয়ে করে আনল। শেষ পর্যন্ত করমালীর মন আশঙ্কায় দোলায়িত হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে যা হবার তাই হলো সৎ মা মনতাজ আলীকে সহ্য করতে পারলো না।

যে মাতৃহারা সন্তান একটিবার মা ডাক ডাকবার জন্য, মায়ের আদর পাবার জন্য তৃষিত হয়েছিল, তার ভাগ্যে দু:খ ছাড়া কিছুই জুটলো না। করমালী দ্বিতীয় পক্ষকে তালাক দিতে মন:স্থির করে কিন্তু এমন সময় ছোটভাই মনিরদ্দিনের সাহায্য পেল।

মনিরদ্দি মনতাজ আলীকে কলকাতায় নিয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রীও মনতাজকে মেনে নিতে পারে না। অত্যাচারে জর্জরিত মনতাজের মন আকুলি বিকুলি করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য। ওদিকে করমালীও অস্থির হয়ে ওঠে তার ছেলেকে কাছে পাবার আশায়। কিন্তু তাদের ভাগ্যে মিলন নেই। একদিন চাচীর অন্যায় অত্যাচারে সহ্যের সীমা অতিক্রম হওয়ায় মনতাজ-

> 'তাই অনেক রাত্রিতে মনতাজ গোপনে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে কোনদিক হইতে কোনদিক গেল বুঝিতে পারিল না। মোটকথা শিয়ালদহ সে পৌছিতে পারে নাই।'[৫৫]

এভাবেই পিতা-পুত্রের জীবনের চরম পরিণতির মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

'মাটি' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে পদ্মার ভাঙনে ভেঙ্গে যাওয়া বিলুপ্ত চর খাঁপুরার অধিবাসীদের সব হারাবার বেদনার পাশাপাশি নতুন চরের জাগৃতিতে পুনরায় অতীতের সুখময় জীবনে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও অন্তিমে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের ব্যর্থতাজনিত প্রবল অন্তর্যন্ত্রণা।

নদীতীরবর্তী জনপদের জীবনের একটি বিশেষ দিক 'মাটি' গল্পটিতে ধরা পরেছে। পদ্মার সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ের যোগ। তাদের সংস্কার বশতই তারা পদ্মাকে গাল দেয়-

> 'শালী ক্ষেপেছে রে ক্ষেপেছে'। ঝপটাস না মাগি বলেই তেড়ে উঠে মাঝি'। গালী দিলে নাকি পাগলী পদ্মার তোড় কমে যায়'[৫৬]

সুন্দরী রাজুচম্পা গ্রামের ষাট বছরের বৃদ্ধ কালে খাঁ পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত। বর্তমানের দুর্বিষহ জীবন যাপনে বিপর্যস্ত কালে খাঁ সুদূর অতীতের নষ্টালজিয়ায় বার বার আশ্রয় গ্রহণ করে–

> 'ঐ সোনার চরে কি না হত'[৫৭]

কালে খাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন হলো নতুন করে সবাই মিলে আবার হাসি-কান্না-আনন্দ বেদনার মধ্য দিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া। কিন্তু পুনরায় তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চর খাঁপুরা জেগে উঠার পর তারা অবহিত হয় যে, পঁচিশ বছর ঐ চরের খাজনা অনাদায়ী থাকায় সেটি সরকারি মালেকি মহালের অন্তর্গত। অত:পর নিলামে চরটি তোলা হলে চর খাঁপুরাবাসী তাদের স্বত্বাধিকার ফিরে পেতে কানুনগো, খাসমহল অফিসার, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হয়। অবশেষে গায়ের জোরে চরের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কালে খাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে পরবর্তী সময়ে তার চিন্তায় পরিবর্তন আসে। কারণ নাতি ফতেজানই এ জীবনে তার শেষ অবলম্বন। চরের দখল নিয়ে অনর্থ-রক্তপাত-হত্যা অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া যারা নিলামে চরের জমি কিনেছে, তারাও চর খাঁপুরার অধিবাসীদের মতই সাধারণ মানুষ, বেঁচে থাকার জন্য হয়ত এ চরই তাদের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এ সত্যও উপলব্ধি করে শাসক গোষ্ঠীর অনুগত একটি মহল স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই চরটি নিলামে তুলেছে। অবশেষে সবাইকে নিয়ে চরে বসবাসের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তাকে মাটির মায়া পরিত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে যেতে হয় মাটির বুকে।

প্রকৃত অর্থে, মাটির প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর মমতা ও ভালবাসার আকুতি যে শক্তিমত্ত ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থ ও দাপটের কাছে মূল্যহীন, তারই বেদনার আলেখ্য গল্পটি। সমালোচক ফজলুল হক সৈকতের মতে–

> ‘দরিদ্র অসহায় মানুষের ওপর ধনীদের, প্রভাবশালীদের অত্যাচারের চিত্র কোন নতুন প্রসঙ্গ নয়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পেষণে এ দেশের জনজীবন হয়ে পড়েছিল অতীষ্ঠ। দরিদ্রের জীবন বিপন্ন করে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষের মেদবৃদ্ধির নিটোল চিত্র ‘মাটি’ গল্পটি।’[৫৮]

‘ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা’ গল্পে শৈশব থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নিত্যানন্দ মুখার্জী গ্রামের যে কোনো উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত যাত্রাআসরে কমিক অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে নির্মল আনন্দ দানে সদাসচেষ্ট। কিন্তু গ্রামের মানুষের উৎসব মুখরিত আনন্দময় জীবনে

আকস্মিকভাবে রাহুর মতো হানা দেয় বেয়াল্লিশের আকাল। ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ কোনোমতে প্রাণ বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে ছুটে যায় একমুঠো অন্নের আশায়।

> ‘দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসেবে ১৫ লক্ষ ছিল। কিন্তু বেসরকারি সূত্রের হিসেবে ৩৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায় এবং ১৫ লক্ষ মানুষ পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। অন্নের জন্য লোকে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করে এবং নর্দমার ভিতর কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্টে ভাগ বসায়। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির বিবরণ অনুসারে বাংলাদেশের ছয় কোটি মানুষের জীবন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলার ৯০ টি মহকুমার মধ্যে ২৯ টিতে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল।’[৫৯]

নিরন্ন মানুষের মুখে সামান্য অন্নের যোগান দিতে গ্রামে লঙ্গরখানা ও চালের আড়ত খোলা হলেও সেখানে স্বার্থন্বেষী শোষকশ্রেণীর অপতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। তাই লঙ্গরখানায় ক্ষুধার্ত মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ‘নাই নাই’ রব ওঠে। আড়তের চাল রাত্রের অন্ধকারে কালোবাজারে পাচার হয়ে যায়। এসব দেখে নিত্য প্রসন্ন নিত্যানন্দের হৃদয় বেদনায় প্লাবিত হয়। সে বোঝে সবই কিন্তু করার কিছুই থাকে না–

> ‘জন্মা নেই, গোটা পৃথিবীতেই কি জন্মা নেই? ধান-চাউল নেই তো ‘বেলাকে’ মাল আসে কোথা থেকে? যারা গরীব তাদের বেলায় নেই; বড়লোকের খুব জোটে। এটা আমরা বুঝতে পারি-এই অভাব-অভিযোগ সৃষ্টি করে বড়লোকের দুটো পয়সা করা আর গরীব মানুষ মারা, এই ত।’[৬০]

একসময় মানুষ ধীরে ধীরে অকাল সামলে উঠলেও পরিচিত অনেকেরই হদিশ না পাওয়ায় সদা উৎফুল্লতার পরিবর্তে বার্ধক্যের ক্লান্তি ও অবসন্নতা তাকে গ্রাস করে। বন্ধু ও সহাভিনেতা মিন্নত আলীর প্রেরণায় ও উৎসাহে সে অতীতের আনন্দমুখরিত জীবনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়। কারণ শোষক ও সুবিধাবাদী শ্রেণী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে শহরে ছেচল্লিশের যে দাঙ্গা বাধায়, তাতে পুনরায় বিপর্যস্ত হয় গ্রামীন জীবন।

> ‘দেশের এই পরিস্থিতি কংগ্রেস-মুসলিম লীগের দ্বি-মুখী আন্দোলন এক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দুই দলের অভ্যন্তরীণ সংকীর্ণতা ও কূটকৌশল সমাজের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যার চরম বিস্ফোরণ হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট

কলকাতায়। তারপর সেই উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য স্থানে। অসংখ্য নিরীহ মানুষকে প্রাণ দিতে হল, এই নৃশংসতার কবলে পড়ে।'[৬১]

এতদিন গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পাশাপাশি বসবাস এবং গান-আমোদ-ফূর্তি-উৎসব-উল্লাসে জীবন অতিবাহিত করলেও এখন একের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস ও সংশয় প্রবল হয়ে ওঠে। বহুদূরের ঢাকা-কলকাতায় দাঙ্গার অভিঘাতে গ্রামের মানুষের জীবনও বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে। শান্তি কমিটির মধ্যস্থতায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাজনিত ক্রোধের আগুন কিছুটা প্রশমিত হলেও অতীতের সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন থেকে তারা বিচ্যুত হওয়ায় স্ব:স্ফূর্ততা, উচ্ছ্বাস ও প্রাণের স্পন্দন তাদের হৃদয় থেকে বিলীন হয়ে যায়।

'দ্রৌপদী' গল্পে গ্রামীণ সমাজে নৈতিক অধ:পতন ও স্খলনের দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে, নারীর প্রতি পুরুষের ভোগবাদী দৃষ্টি ও সুবিধাবাদী মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। এ বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে লেখক প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের দ্রৌপদী সম্পর্কিত উপাখ্যানকে অবলম্বন করে বর্তমান সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন।

দ্রৌপদী সম্পর্কিত পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখক পাঠকের কাছে যে সমাজসত্য উপস্থাপন করেছেন, তা হলো প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারীর প্রতি পুরুষের ইন্দ্রিয়লিপ্সু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেনি এবং স্বীয় লালসা চরিতার্থ করতে ক্ষমতাশালী পুরুষ শক্তি ও দাপটের পাশাপাশি ধর্মকেও অবলীলায় ব্যবহার করেছে।

এ গল্পে বর্ণিত হয়েছে কুলী নামক এক সাধারণ-সহজ-সরল যুবতীর পতিতা রূপে সুরমা, অবশেষে শরিফা নাম্নী বহুভর্তৃকায় রূপান্তরিত হওয়ার চরম গ্লানিকর বৃত্তান্ত। চাঁদখালী গ্রামের কুলী পাশের বাড়ীর যুবক নীলরতনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ে জড়িয়ে গর্ভবতী হলেও নীলরতন কুলীর পরিবর্তে সোনাপুরের বোসবাবুর মেয়েকে বিয়ে করে। কুলীর সন্তান ধারণের খবর জানার পর কলঙ্কের ভয়ে সে কুলীকে নিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে ও পতিতালয়ে বিক্রির পর সুরমা নামে শুরু হয় তার পতিতা জীবন।–

'কুলী একদিন চোখ মেলে দেখল, সুরমা হয়ে সে বাজারে পণ্যের দামে বিক্রি হচ্ছে। এ জীবন তো সে চায়নি, এ কোথায় থেকে সে কোথায় এলো। নদী ডোবা মানুষ, পাড় ভেবে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। মন-প্রাণ পাখা ভাঙ্গা পাখীর মত নিরুপায়ে ঝটপটায়, সুরমা আর্ত বেদনায় কাতরায়। নিত্য নতুন গাহেক আসে আর যায়। গতর খারাপ, দেহ ভাল নাই। এ সবেও আটকায় না। সুরমার অনেক দাম, বাড়ী ওয়ালির যে খুব ক্ষতি।'[৬২]

সে মুক্তিলাভের জন্য নীলরতনকে অনুরোধের পর বহুভর্তৃকা হিসেবে তার আশ্রয় জোটে সোনাপুর গ্রামে। যেহেতু নীলরতন ঐ গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তাই কুলীকে ভোগ করতে সে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। গ্রামের মাতবরকে দিয়ে সে একটি চুক্তি করায় যে,কুলী একজনের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আরো চারজন পুরুষ তাকে যথেচ্ছ ভোগ করতে পারবে। এরপর কুলী 'কবুল' উচ্চারণের মাধ্যমে হারানের কাছে 'মন বান্দা' দিলেও কুরমান, ফাজিল, মাতব্বর ও গ্রামের মসজিদের ইমাম গহের মোল্লার কাছে অবাধ যৌনসম্ভোগের 'করাল' দেয়। এক্ষেত্রে মসজিদের মোল্লা হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ধোকার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়-

'করাল থাকলে হাদিসে বাধা-নিষেধ নাই বরং করাল ভাঙলেই হাদিসের বরখেলাপ।'[৬৩]

তবে কুলীকে নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় তখন, যখন চুক্তি বহির্ভূতভাবে নীলরতন তাকে ভোগ করতে চায়। নীলরতনকে প্রত্যাখানের মাধ্যমে কুলী পরোক্ষভাবে তার প্রতি নীলরতনের হঠকারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অপমানিত নীলরতন কুরমান, ফাজিল, গহর ও হারানের নামে মিথ্যা মামলা করলে পরিস্থিতির শিকার হয়ে থানার দারোগার কাছে এ অবমাননা ও অপমানজনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে কুলী বাধ্য হয়।

'সামাজিক' গল্পে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের যাচ্ছেতাই রকমের নিপীড়নের মূলেও রয়েছে অবাধ নারীপ্রীতি ও ভোগলিপ্সা। নবীনগর গ্রামের প্রধান মীর সাহেব বৈষ্ণব নরোত্তমের পালিত কন্যা সরলার প্রতি আসক্ত বলেই তাকে পেতে ব্যর্থ হয়ে নরোত্তমকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বলে। নতুবা দুদিনের মধ্যে সরলার কণ্ঠীবদলের হুমকি দেয়।

‘হয় গাঁও ছাড়, নয় আজ কাল দু’দিনের মধ্যে তোমার মেয়েকে পার কর। আমি গাঁয়ের মধ্যে আর এমন অনাসৃষ্টি সইতে পারবো না। হয় এসপার নয় ওসপার।’[৬৪]

সরলার নামে গ্রামের মুসলমানদের সম্মান বিনষ্টির মিথ্যা অভিযোগ এনে মীর সাহেব তার চক্রান্ত বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে গোপনে ময়নাকে নরোত্তমের স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে সরলাকে পেতে চায়। কিন্তু সরলা মীর সাহেবের খলতা, ক্রূরতা ও অপকর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকায় মীরসাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মসচেতন সরলা মীরসাহেবের অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী নয়।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নরোত্তম কৈলাশের কাছে যায় পরামর্শের জন্য। কৈলাশও অনুধাবন করে সমস্ত পরিস্থিতি। একসময় সে নিজেই সরলার সঙ্গে কণ্ঠীবদলে আগ্রহী হয়। অবশেষে যখন কণ্ঠীবদলের ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়। তখন কুচক্রী মীরসাহেব তার লোকবলের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে কৈলাশকে হত্যা করে। শোষক শ্রেণীর যথেচ্ছাচারে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে গ্রামের অবহেলিত-শোষিত জনগোষ্ঠীর দু:খ-দুর্দশার চিত্র এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে এ গল্পে।

‘বক্‌সো আলী পণ্ডিত’ গল্পটি গ্রামের পাঠশালার এক ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, অভাবী, দরিদ্র মাষ্টারের করুণ জীবনকথা নিয়ে রচিত। অভাব, অনটনের মধ্যে দিয়েও জীবনের কঠিন রূপ সহ্য করে নিয়ে চলে পন্ডিত। সৎ জীবনের বিড়ম্বনা অনেক। বক্‌সো আলী পন্ডিত তার পাঠশালায় ছাত্রদের শিক্ষা দিতে চায় ন্যায়-নীতি ও সততা। অথচ সৎ জীবন যাপনের মর্মান্তিক যাতনা সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। বাড়িতে নুন আনতে পান্না ফুরায় অন্যদিকে বিভিন্ন মানুষের কাছে তার ঋণ। পন্ডিত ভাবে এ যন্ত্রণার পরিবর্তে মৃত্যুই ছিল শ্রেয়। ফতে আলী ডাক্তারের কাছে ওষুধের দাম বাকি থাকায় বেগম সাবেরের দু’গাছি গহনা জমা দিতে আপতত ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচে। গহের হাজী বক্‌সো আলীকে দোষারোপ করে, বাংলা পড়িয়ে গাঁয়ের ছেলেপেলেকে বেয়াদপ বানানো হয়েছে। তার বদলে আরবি,উর্দু পড়ালে একটু আখেরে কাম হতো। পণ্ডিত বলে, বাংলা মায়ের জবান। তাই বাংলা না শিখিয়ে উপায় কি। বেইমান গহের হাজী যেদিন ফইজদ্দির পালানের জমিটুকু দখল করে নেয় সেইদিনও বক্‌সো আলী পণ্ডিত কিছুই করতে পারে না।

পণ্ডিত একদিন চোখের ছানি কাটাতে শহরে যায়। তার অনেক আশা সমস্ত অন্যায়-অবিচার একদিন শেষ হবে। সেই সোনার বাংলা আবার তার স্বাধীন, সুন্দর, পরিপূর্ণরূপ ফিরে পাবে নতুন চোখে পরিষ্কারভাবে সে সব কিছুর স্বাক্ষী হতে চায়। বকসো আলী বুক বেঁধে ঢাকা যায়। মেডিক্যাল কলেজের সামনে সেদিন ছাত্রজনতার শ্লোগান ওঠে- রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বাইশে ফেব্রুয়ারীর সকালে-

> ‘খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছিল, গতকল্য মেডিক্যাল কলেজের নিকটে বাংলা ভাষার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্র জনতার উপর পুলিশ পর পর কয়ের রাউন্ড গুলি ছুড়ে, ফলে দুইজন ছাত্র ও একজন অজ্ঞাত নামা বৃদ্ধ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। মুখে মুখে শোনা গিয়াছিল গুলির আঘাতে বৃদ্ধের মাথার খুলি উড়িয়া গিয়াছে। মাটিতে লাশ পড়িয়া রহিয়াছে বিরাট একটি খণ্ডতয়ের মত।’[৬৫]

গুলির আঘাতে যে বৃদ্ধের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল সে আমাদের হতভাগা বক্‌সো আলী পণ্ডিত। বার বার কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হলেও কখনও জীবনযুদ্ধে বিমুখ হয়নি বক্‌সো আলী পণ্ডিত। তার দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের অসংখ্য জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে।

‘আলীজান’ গল্পে আলীজান জমিদারের ডানহাত হিসেবে অনেক অন্যায় অপকর্মে জড়িত ছিল। কিন্তু যার জন্য সে খুন পর্যন্ত করেছিল সেই জমিদার তার কষ্ট, যন্ত্রণা, অভাব বুঝেও না বোঝার ভান করে। আলীজান ধিক্কার দেয় নিজেকেই-

> ‘শালা জমিদার ভূতে ভুলানোর মত ভুলাতে ভুলাতে পথ ভুলিয়ে একেবার মরণের নজদিগে নিয়ে এসেছে। উঃ, এ শালার জাতটাই বুঝি নিমকহারাম আর স্বার্থপরের বিষে ভরা ! নইলে তোর জন্য কি না করেছি। মানুষ খুন, জালিয়াতি, জুয়াচরি, জেল–অবশেষে নিজের মেয়ের বয়সী পরের মেয়েকে বনখাটাশে মুরগী ধরার মত ধরে নিয়ে পালিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সব বিসর্জন দিয়েছি তোর জন্য। আর তুই কি না শেষে বললি, বসে খেলে আর কতদিন চলে আলীজান, আমার কাচারিতে পেয়াদার কাম কর, পেটের ভাততো জুটবে।’[৬৬]

ঘেন্না হয়েছিল নিজের জীবনের প্রতি। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে আলীজান, ঘুরতে ঘুরতে আজ সে রিক্সা ড্রাইভার। রিক্সা চালাতে চালাতে পুরনো স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মনে পড়ে ফতে আলী পণ্ডিতের কথা–

> 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করা চাচা, সত্যি ও জাতটা ঐ জমিদারের জাতটা চিরটা কাল চাম-বাদুড়ের মত আমার তোমার ন্যায় গরীব লোকের রক্ত শোষণ করেই আসছে। ওকে সাহায্য করলে অন্যায়কেই প্রশয় দেওয়া হবে।'[৬৭]

এই পণ্ডিতই তাকে জমিদারতন্ত্রের অন্ত:সারশূন্যতা ও জমিতে কৃষকের অধিকার সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। আজ জীবনের সবকিছু হারিয়ে আলীজান এই সত্য অনুধাবন করে যে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই জমিদার তাকে ব্যবহার করেছিল। রিকসা চালাবার মত অমানুষিক পরিশ্রম করেও আলীজান জীবনবিমুখ হয়নি বরং সমস্ত অন্যায়-অবিচারের সঙ্গ ছেড়ে সে জীবনকে সৎ পথে পরিচালনার প্রবল তাগিদ নিজের ভিতরে অনুভব করে। রাত-দিন পরিশ্রম করে পুনরায় জমিদারের কাছে থেকে জমি-জায়গা উদ্ধার করবে, ঘর গৃহস্থালী করবে, অর্থাৎ সে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে প্রত্যাশী হয়। আর এভাবেই স্বার্থসচেতন ব্যক্তির স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি আলীজানের চেতনাগত পরিবর্তন ও মানুষ হিসেবে নিজেকে মূল্যায়নে সক্ষম হয়। জমিদারের পতন ঘটানোর সংগ্রামে সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ '*অষ্টপ্রহর*' (১৯৭০ ইং, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) এ গল্প গ্রন্থের 'মা' গল্পে লেখকের যে জীবনবোধ তার প্রকাশ ঘটেছে সন্তান কামনায় অধীর এক নারীর বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে। নিষ্ঠুরতার প্রতীক কালু তার পঙ্গু জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা। ফতেজানকে নিয়ে কালুর দাম্পত্য জীবনের দ্বাদশ বছর অতিক্রম হতে চলছে। ভিক্ষাবৃত্তির সুবিধা হবে বলে সে তার পঙ্গু জীবনকে আরো পঙ্গু করে তোলে নিজের শরীরে পচনশীল দগদগে ঘাকে জিইয়ে রেখে। যেদিন পয়সাকড়ি কম থাকে সেদিন কালুর মেজাজও খারাপ থাকে। ফতেজান ও হয়তো তেমন কিছু জুটিয়ে আনতে পারে না সেদিন। কালুর সঙ্গে ফতেজানের তখন খুব একচোট হয়ে যায়। ফতেজানকে কালু দোষারোপ করে, আজতক একটা বাচ্চা বিয়োতে

পারলি না, বাচ্চা ছাড়া আজকাল কামাই করা যায় না, অনেক চিন্তাভাবনার পর কালু বহু চেষ্টাচরিত্র করে একদিন একটি নাদুসনুদ্‌স বাচ্চা চুরি করে আনে। বাচ্চা পেয়ে ফতেজানের মাতৃত্ব জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবে, কোন মায়ের বুক খালি করে কালু তাকে আনল! কিন্তু অসুরটা যখন তাকে বলল-

> 'না ভারী নাদুস নুদুস, না খাইয়ে রাখতে হবে অনেকদিন, তাপর একটা হাত মুচড়িয়ে ভেঙ্গে নিলেই চলবে, একটা চোখ গালিয়ে নিলে আরও ভাল হয়।[৬৮]

তখন ফতেজানের মনে হলো কালু মানুষ না। দয়ামায়াহীন একটা জন্তু সে। ভয়ার্ত জননী তখন শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। 'মা' গল্পে বাৎসল্যের এই যে ছবি, পাঠকের হৃদয় তা স্পর্শ করে। ফতেজানের কোমল মাতৃত্ব শিশুটিকে কালুর নিষ্ঠুর পরিকল্পনা থেকে বাঁচাতে গিয়ে অবর্ণনীয় সংকটের সম্মুখীন হয়। ফতেজান নারী বলেই সম্ভবত স্বামীর বারো বছরের সংসার উপেক্ষা করে সেই সঙ্কটের সমাধানস্বরূপ ঊর্ধ্বশ্বাসে পাড়ি জমায় অজানার পথে। ফতেজান নারী, নারী তার আপন হাতে অনেক মমতায় গড়ে তোলে নিজের সংসার। কিন্তু ফতেজানের নারীত্ব এখানে তার মাতৃত্বকেই জয়যুক্ত করে তুলেছে। হয়েতো নারীর কাছে মাতৃত্বের চেয়ে অন্য কিছু বড় নয় বলেই। কালুর ভেতরে পশুর যে প্রকৃতি রয়েছে লেখক সেটাকে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন। মোটের উপর 'মা' গল্পটি সরদার জয়েনউদ্দীনের এক অনন্য শিল্পকর্ম। ফতেজানকে যতখানি স্পর্শকাতর মাতৃত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলা যায়, তিনি তা করেছেন। অন্যদিকে কালুকে যতখানি বীভৎসরূপে উপস্থাপিত করে তোলা প্রয়োজন, তিনি সেই কাজটিও বেশ দক্ষতার সাথে করেছেন।

'দুটো জ্বীন ও একটি প্রেম' গল্পটিতে ও গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস কুসংস্কার-অলৌকিকতা-মানসম্মানের মোহ প্রভৃতির অন্তরালে নর-নারীর হার্দিক সম্পর্ক ও প্রেমাবেগের পরিণতিই মূল উপজীব্য বিষয় হয়েছে। কাদের মুন্সী সাত গ্রামের মানুষের ধর্মীয় আচার-আচরণ, মসজিদের ইমামতি, মিলাদ পাঠ ও ফতোয়া প্রদান, পরিবারে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা পালনের ক্ষেত্রে যতটা সচেতন, ছোট ভাইয়ের জমি কৌশলে আত্মসাতের ক্ষেত্রেও ততটা কৌশলী। তার মেয়ে মরিয়ম তার ভাইয়ের ছেলে মন্টুর প্রতি আসক্ত হলেও সে জোরপূর্বক নয়ান হাজীর

দোজবরে ছেলে রহম কাজীর সঙ্গে মরিয়মের বিয়ে দেয়। এ বিয়েতে অনিচ্ছুক মরিয়ম প্রকাশ্যে বিরোধিতায় অক্ষম হলেও সে তার স্বামীকে মেনে নিতে পারে নি। তাই বাসর রাতেই স্বামীকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করায় সবার ধারণা জন্মায় যে তার ওপর জ্বীনের বাদশা ভর করেছে।

জ্বীনকে পাকড়াও করতে নয়ান হাজী চেষ্টার ক্রুটি করে না কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে কাদের মুন্সীকে খবর দেয়। কাদের মুন্সী মরিয়মের আচরণের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কোনো কিছুতেই যখন মরিয়মকে বশ মানানো যায় না তখন সে পিতা হয়েও বংশের মান-সম্মান রক্ষার জন্য নিজের মেয়েকে বিষ খাইয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

মরিয়মের মার সন্দেহ হয় কাদের মুন্সীর আচরণে। পরে সে প্রমাণ পায় যে ব্যাপারটা সত্যিই। তাই সে সমস্ত ঘটনা মন্টুকে জানাতে বাধ্য হয়। মন্টু চাচীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানতে পেরে পরদিন ভোরেই মরিয়মকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। অন্যদিকে কাদের মুন্সী বেয়াই বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পর সব শুনে মিথ্যা প্রচার করে যে মন্টু অসুস্থ। মন্টু বেশে যে মরিয়মকে নিয়ে গেছে সে আসলে জ্বীন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে ও এই কাহিনী বানিয়ে বলতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম আভিজাত্য ও বংশগৌরবের মোহে কাদের মুন্সীর মতো মানুষেরা এভাবেই যুক্তি-বুদ্ধি বিবেচনাবোধ হারিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি-কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির স্রোতে নিমজ্জিত হয়।

‘মামলা’ গল্পে সমাজের অভাব অনটন, মানুষের মহত্ত্ব বিবেচনাবোধ ও স্বার্থহীন সদর্থবোধক জীবন ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে। দরিদ্র কৃষক বশারত। যদিও এবার ফসল ভালো হয়েছে তথাপিও বছর দু’ই এর আগের বন্যার কথা মনে হয় তার। আর তার সঙ্গেই মনে পড়ে প্রয়োজনীয় ও বহু শখের একখানা নৌকার। কিন্তু নৌকা কেনার টাকা কোথায়, এভাবনাই তাকে দিশেহারা করে দেয়। অবশেষে তাদের একমাত্র অবলম্বন শামলা রঙের বাছুরটাকে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ছানুর মা আর বশারতের গরুটা দেখলে আসলেই লোভ হয়। বাজারে শেষমেষ পঞ্চাশ টাকাতেই সেটাকে বিক্রি করে দেয়। পঞ্চাশ টাকায় পছন্দসই একটা নৌকা কেনে। কিন্তু এ নৌকাটি ছিল চোরাই নৌকা, যদিও এ ব্যাপারে সে কিছুই জানতনা। এবং এই নৌকার আসল

দাবিদার দানেজ মণ্ডলের অভিযোগের ফলে একসময় বশারতকে মামলার দায়ে জেলখানায় যেতে হয়। ক্রোককৃত নৌকাটি কারাগারে অব্যবহৃত ও অযত্নে থেকে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার কারণে ও রোদে শুকিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জরাজীর্ণ আকার ধারণ করে।

নৌকাটি অব্যবহৃত থেকে অকার্যকর হয়ে পড়ে থাকলেও এর অস্তিত্ব রক্ষা করাই এক সময় দানেজ মণ্ডলের জন্য জরুরি হয়ে ওঠে। তাই সে নিজেই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ছয় মাস কারাবাসের পর বাড়িতে ফেরার পথে আকস্মিকভাবে নৌকা পরিষ্কাররত দানেজ মণ্ডলকে দেখে বশারত বিস্মিত হয়। দানেজ তাকে নৌকাটি সংস্কারের পর ব্যবহারের জন্য অনুনয় করে। বশারত দানেজের এই আচরণে বিস্মিত হল। কারণ যার জন্য তাকে কারাগারে করতে হয়েছে, সেই কিনা তাকে নৌকাটি ব্যবহারের জন্য মিনতি করছে। সে এ প্রস্তাব অস্বীকার করে, যেহেতু আইনগত নৌকাটির মালিক দানেজ মণ্ডল। কিন্তু দানেজ নৌকার ওপর তার দাবি অস্বীকার করে এবং বশারতকে নৌকাটি ফিরিয়ে দেয়। এভাবেই এ গল্পে ব্যক্তিস্বার্থ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মানবধর্ম, কর্তব্যবোধ ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার উন্নত মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়।

'মানুষের মত মেয়ে মানুষ' গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সংগ্রামরত ও সাহসী এক সংস্কারহীন নির্ভীক অকুতোভয় নারীর দু:সাহসী জীবনভাবনাকে রূপায়িত করেছেন। যে কোন মোহ ও প্রলোভনের ফাঁদে আবদ্ধ হয় না। তার কর্তব্যবোধ ও মায়া-ভালবাসার টানে সে গ্রামের মানুষের কুৎসা রটনা ও গুজবকে অবলীলায় উপেক্ষা করে।

ব্যালমতী তিন-চার সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও রূপের জাদুতে এখনও যে কোনো পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম। কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সে তিন পুরুষের স্ত্রী হলেও কারো সংসারেই স্থির হতে পারে নি। তালাকের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও এখনো মেয়েদের একবার দেখতে সে ছুটে যায় পূর্বের স্বামীর গৃহে। এ ব্যাপারে গ্রামের মানুষ কুৎসা রটনা করলেও ব্যালমতী সেসব গায়ে মাখে না। সে গাঁয়ের অশিক্ষিত নারী হলেও তার চিন্তা-ভাবনায় লক্ষ্য করা যায় শিক্ষিত-সচেতন নারীর স্বচ্ছতা। তাই সুখ-দু:খ-উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সে তার কাজ ও চিন্তা-ভাবনাকেই প্রাধান্য দেয়। অর্থ-বিত্তের প্রতি নির্লোভ ব্যালমতী

অর্থের বিনিময়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণে রীতিমত খড়গহস্ত। নিজ ধর্মের প্রতি তার রয়েছে অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। অথচ ধর্ম সম্পর্কে তার মনে কোন গোঁড়ামি বা সংস্কার নেই। আর এ কারণেই সে জীবিকার প্রয়োজনে খ্রিষ্টান বাড়িতে কাজ করে। গল্পের কথক তাকে স্তুতিবাক্যে ভোলাতে চাইলে সে তীব্রকণ্ঠে–

'ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে বললো, ব্যালমতী মেয়ে মানুষের সাথে ঘর করে না। এ জন্যই আমার তৃতীয় সোয়ামীকে ছেড়ে এলাম। তুমি মেয়ে মানুষ কয়াল। থুক্ তোমার পৌরুষে।'[৬৯]

জীবনের পথ পরিক্রমায় ব্যালমতী কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখে থমকে দাঁড়ায় না। নারীর এ প্রাতিস্বিক রূপ বিশ শতকের বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সত্যিই দুর্লভ।

'এক অঙ্গ দুটি মুখ' গল্পে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের উপর পদ্মার প্রবল আঘাতের ছবি ফুটে উঠেছে। গোয়ালন্দ অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও আনন্দহীন করার জন্য পদ্মার ভূমিকাই সবচাইতে বেশি। নদীতে যে সময়ে মাছ পাওয়া যায় না। সে সময় তারা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন পার করে। অতীতে এ পদ্মা ছিল প্রমত্ত-প্রবল বেগবতী। তখন মাছের প্রাচুর্যে জেলেদের মুখে ফুটতো আনন্দের হাসি। গত বছর পদ্মার স্রোতে জেলেদের ঘরবাড়ি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও পূজার আয়োজনের মাধ্যমে তারা পদ্মাকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট। কারণ পদ্মা শান্ত হলে তারা পুনরায় মাছ ধরতে সক্ষম হবে। তাদের দু'চোখে একটি স্বপ্নই শুধু জড়িয়ে থাকে :

'রূপের চাকতির মতো জলের বুকে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়বে ইলিশ, ইলিশ আর ইলিশ।'[৭০]

কিন্তু পদ্মার বুকে চর জেড়ে ওঠায় তাদের এ স্বপ্ন ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে। তাই অনেক আয়োজনের মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পদ্মার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনের জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। পদ্মার প্রমত্ততা জেলেজীবনের জন্য ইতিবাচক হলেও তা সবার জন্য ফলপ্রসূ বা কল্যাণসূচক নয়। তাই নেফাজ মণ্ডলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় পদ্মার ভাঙ্গনের ফলে বিপর্যস্ত মানুষের করুণ জীবনের কাহিনী। পদ্মাতীরবর্তী মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়িঘর পদ্মার স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। তার জমি বাবা-মার কবর সব কিছুই পদ্মার বুকে নিমজ্জিত। তিন

পুরুষের পৈতৃক ভিটে বাড়িটিও যে কোনো সময় বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায়। আশ্বিনে পদ্মার বুকে চর পড়ায় তাদের সান্তনা ছিল-

'চর যখন পলো মাটিও পড়বি, ফসল ফলবি, সোনাবরণ ধানে মাটির কোল ভরে যাবি।'[৭১]

কিন্তু তাদের আশা, নিরাশায় পরিণত হয় পদ্মার চর ধূ-ধূ বালিতে পরিপূর্ণ হওয়ায়। তবুও পদ্মার চর পলিমাটিতে আবৃত হওয়ার প্রতীক্ষায় তারা দিন গোনে, আর নতুনভাবে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু জেলেরা পদ্মায় পূজা দিলে পদ্মা পুনরায় উত্তাল হয়ে উঠবে, যা তাদের উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি করে।

প্রকৃত অর্থে এই পূজার ফলেই যে পদ্মা জেগে উঠবে আর পূজা না দেয়া হলে চর জাগবে তা নয়, এটা জেলেদের একটা সংস্কার। মানুষের জীবনস্রোত কিভাবে প্রবাহিত হবে সে সম্পর্কে পদ্মা উদাসীন। অবিরাম ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে সে যুগে যুগে তার নিকটস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনকে করে তোলে সংগ্রামশীল। এ গল্পটি তারই একটি অনবদ্য প্রকাশ।

'*বেলা ব্যানার্জীর প্রেম*' (১৯৭৩ ইং, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ। এর 'প্রাণিজ' গল্পে হিসামুদ্দিন খাঁর বয়স যখন পঞ্চাশের কোটায় তখন তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। সংসারের এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ভীষণ চিন্তায় পড়ে হিসামুদ্দিন। প্রথম পক্ষের ছেলে ফইমুদ্দিন থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করায় হাল-লাঙল চালিয়ে চাষাবাদের কাজ করতে চায় না। চাকরীর খোঁজ করতে করতে ব্যর্থ হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটাও সংসারের কাজ-কর্ম কিছুই করতে পারে না। এমন অবস্থায়-

'হিসামুদ্দি কাশির দমকে হাঁপায় আর সংসারের দিকে তাকিয়ে অভিসম্পাত দেয়।'[৭২]

অবশেষে অনেক খোঁজ আর হিসাব কিতাবের পর গরীব ভদ্র ঘরের বিধবা সুন্দরী মেয়ে হুরজানকে বিয়ে করে। হুরজানও গাঁয়ের আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত মুখ ভার করে স্বামীর সংসারে প্রবেশ করে। তার স্বামী হিসামুদ্দিনের কিছুরই অভাব নেই কিন্তু কোথায় সেন হুরজানের ব্যাথা। হুরজান সংসারের সব কাজ নিজের মতো করে। যত্ন করে ছেলে ও মেয়ের। অথচ

হিসামুদ্দিন কিছুতেই স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। অবশেষে একদিন প্রীতিমধুর হাসিতে হুরজান মেয়ের জন্য ছেলে দেখতে বলায় হিসামুদ্দিন সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেয় ঘটা করে। আত্মীয় স্বজন গ্রামের মানুষ সকলেই হুরজান ও তার স্বামীর প্রশংসা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া জানাল। রাতে আবেগঘন মহুর্তে হিসামুদ্দিন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে হুরজান এতে কোন আপত্তি করেনা। নির্দ্বিধায় সেও স্বামীকে কাছে টানে। কিন্তু হুরজানের জীবনের একমাত্র গোপন আনন্দ এখন ফইমুদ্দিন যা কেউ জানতে পারে না।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের অগ্রন্থিত গল্পগুলোর মধ্যে 'মাটির কাছাকাছি' গল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। এখানে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের করুণ ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ছুতোর মিস্ত্রি ছবু ও কুরমান মোল্লা তারা দুজনেই পাকিস্তানের পক্ষে। তারা নানা ছুতোয় এটাই বোঝাতে চায় যে যা হচ্ছে দেশের পক্ষে তাই ভালো। দেশ থেকে হিন্দু উচ্ছেদ হলে মুসলমানদের নিয়ে খাঁটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এযুগের ছেলে সাগর, এরাদ এরা দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারে। ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের মানুষের উপর শোষণ অত্যাচার তারা কিছুইতেই মেনে নিতে চায় না। এই ভয়াবহ অন্যায় মানুষের জীবনে কতখানি যন্ত্রণা বয়ে আনতে পারে তা এরাদ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে। মিলিটারিদের উড়োজাহাজ থেকে বৃষ্টির মত গুলি রক্তের ঢল নামিয়ে দিচ্ছে–

> 'সেই রক্তের স্রোতের মাঝখান দিয়ে অনেকেই ফ্যাকাসে মুখে হেঁটে ফিরছে আর এ মুখ ও মুখ উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আপন জনের মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও পাশে কাঁপাকাঁপা এক উচ্চ স্বর শোনা গেল, চেয়ে দেখি মধু পালের মা। বুড়ী ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, ওগো ভালোমানুষেরা আমার মধুকে দেখেছ তোমরা, তাকে একটু খুঁজে দাও না বাবারা।'[৭৩]

গায়ের জোয়ান ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবকের দলে একদিকে যোগ দেয়। আর একদিকে জামাতে ইসলামের লোকেরা যারা ধর্মের নামে ব্যবসা করে, বার বার রং বদলায় তারা গ্রামে মিলিটারি পৌছবার খবর পেয়েই এক জায়গায় জমায়েত হয়ে চার কলেমা শিখতে ও শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ গাঁ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে আরম্ভ করে। শানকী আর শানকীর মা তারাও ভিটে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার খোঁজ করতে শানকী জানতে পারে

বাবা ছবু মিস্ত্রি মোল্লার বাড়ি। তারা মোল্লা বাড়িতে যায় দেখে খেপু ধুপীর নব্বই বছরের বুড়ী মাকে তার বাবা ছবু বলছে-

> 'ভাগো হেঁয়াছে বিধর্মী কাঁহাকা, তোমাদের জন্যইতো আজ দেশ শুদ্ধ লোকে এমন হেনস্তা হতে যাচ্ছে। যাওনা ভোট দাও গিয়ে শেখ সাহেবের নৌকায়। তখনই পই পই বলেছিলাম, আল্লাহর মিজানে ভোট দাও, আল্লাহ খুশী হবে। ইসলাম কায়েম হবে, লোকে ধর্ম কর্ম নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। ...তোমাদের শেখ আর নাই, তানিও যমের বাড়িই গেছেন ..... এতোক্ষণে ও কম্ম হয়ে গেছে।'[৭৪]

সাধারণ মানুষ এ খবর আর মেনে নিতে পারে না। হাতের নারিকেল ছুড়ে মেরে বাবাকে রক্তাক্ত করে শানকী আর কালনাগিনীর মতো ফণা তুলে ফুসতে থাকে মা-মেয়ে।

'মৃত্যু নয় অন্যকিছু' গল্পে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হাফিজ সাহেব শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক মৃত খবির মুন্সীর যুবতী কন্যা ঝাঁপা হাফিজ সাহেবের বাড়িতে কাজ করতে আসে। হাফিজ সাহেবের স্ত্রী কন্যাসম ঝাঁপাকে ভালবেসে কাছে টেনে নেয়। তাদের যত্নে ও দু'মুঠো ভাতের বন্দোবস্তে ঝাঁপার শরীরের শ্রী ফিরে আসে।

কন্যাসম ঝাঁপার দুর্বলতার সুযোগ নেয় হাফিজ সাহেব। ঝাঁপা গর্ভবতী হলে এর দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঝাঁপাকে রেখেই হাফিজ সাহেবরা ঢাকায় ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে। ঝাঁপা অনেক প্রতীক্ষা করে থাকে যে যাবার সময় শেষ মুহুর্তে হয়তো তার ডাক পড়বে। কিন্তু তার ডাক আর আসে না। ঝাঁপার প্রকৃত অবস্থা জানাজানি হলে তার উপর সমাজের মানুষের অত্যাচার কিরূপ হবে এসব ভাবনা ঝাঁপা আর তার মাকে অস্থির করে তোলে। অসহায় মা ভবিষ্যতের চিন্তায় মেয়েকে আত্মহত্যার পথে উৎসাহিত করে। ঝাঁপাও মনে মনে ভাবে–

> 'সব মানুষ যদি অমানুষ হয় তবে মরার পথ তো খোলাই আছে। ছাগলের গলার দড়ি আছে, রান্নাঘরের বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো পাতিলের এন্ড্রিন আছে, আছে বাড়ির সামনে অথৈ পদ্মা। অতএব ভাবনা কি!" মানুষে এমনও হতে পারে, পৃথিবীতে সত্যিই কাউকে বিশ্বাস নেই।'[৭৫]

অবিশ্বাস ঝাঁপাকে আত্মঘাতি করে তোলে। কিন্তু নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঝাঁপা বুঝতে পারে মৃত্যু নয় হাফিজ সাহেবদের মতো বড়লোকদের সাথে ভালবাসার সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিদ্রোহ। আর এ রূপ ভাবনাই তাকে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে প্রত্যয়ী করে তোলে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন গ্রামের অন্তরঙ্গতাকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন। গ্রামীণ পরিবেশ, মানুষ, তার পারিপার্শ্বিক আবহ, জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আনন্দ জটিলতা তার গল্পে চিত্রিত হয়েছে পরম মমতায়। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে রয়েছে বিচিত্র সব কুসংস্কার, জটিল জীবনসংকট। নারী এ সমাজে চিরদিনই অবহেলিত, বঞ্চিত, নানা উপায়ে নিস্পেষিত। এ সকল পশ্চাৎপদতার পরিচয়ও উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। কিন্তু সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছোটগল্পে যে দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হলো প্রতিবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ। গল্পের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই শ্রেণী শোষণ, লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড তাগিদ পোষণ করে, যা তাদের মুক্তির প্রাথমিক শর্ত।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা ঃ

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, পুনর্লিখিত ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫, কলকাতা মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২২৬

২. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, বাংলা একাডেমী সংস্করণ, মার্চ, ১৯৭৭, ঢাকা, পৃ. ১৫৫

৩. ফজলুল হক সৈকত, *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ সমকাল*, একুশে বইমেলা ২০০৮, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৯১

৪. *সরদার জয়েনউদ্‌দীন, গল্প সমগ্র*, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৬, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৪

৫. ঐ, পৃ. ১৪

৬. ঐ, পৃ. ১৫

৭. ঐ, পৃ. ১৫

৮. ঐ, পৃ. ১৫

৯. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-১৪০

১০. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-২২

১১. চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, জুন ২০০৯ পৃষ্ঠা-৯৮

১২. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-৩১

১৩. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-১৪৩

১৪. ফজলুল হক সৈকত, *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

১৫. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-৩৮

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৯

১৭. চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবিব, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, জুন ২০০৯ পৃষ্ঠা-৯৭

১৮. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-৪৭

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩

২০. ঐ, পৃষ্ঠা-৫১

২১. ঐ, পৃষ্ঠা-৫০-৫১

২২. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪

২৩. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-৬১

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৭০

২৫. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-১৪৫

২৬. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-৮৫

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৬

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৫

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৬

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা-৮৯

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা-৯০

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৪

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৪

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৮

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৮

৩৬. ঐ, পৃ-১০৪

৩৭. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-১৪৬

৩৮. *সরদার জয়েনউদ্‌দীন*, পৃষ্ঠা-১১১

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১১২

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা-১১২

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা-১১২

৪২. ঐ, পৃষ্ঠা-১১৩

৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১১৩

৪৪. ফজলুল হক সৈকত, *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*, পৃষ্ঠা-১০০

৪৫. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-১১৭

৪৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১২২

৪৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৩

৪৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৫

৪৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৬

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩০

৫১. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৯

৫২. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৯

৫৩. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃষ্ঠা-১৪৭

৫৪. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-১৪০

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৫

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪

৫৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫৫

৫৮. ফজলুল হক সৈকত, *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*, পৃষ্ঠা-১০৫

৫৯. ভবানী সেন, *ভাঙ্গনের মুখে বাংলা*, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৪৫, পৃষ্ঠা-১,১০

৬০. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-১৬৭

৬১. শাহীদা আকতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, জুন ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-৫০

৬২. *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পসমগ্র*, পৃষ্ঠা-১৭৮

৬৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৬

৬৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭৯

৬৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৪

৬৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৬

৬৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৭

৬৮. ঐ, পৃষ্ঠা-২১৭

৬৯. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯১

৭০. ঐ, পৃষ্ঠা-৩১১

৭১. ঐ, পৃষ্ঠা-৩১২

৭২. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮৫

৭৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৩৩

৭৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৪০

৭৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৪০৬

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন

তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন তাঁর ছোটগল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, প্রকৃতি, নিসর্গ, মানুষ ও তাদের বিচিত্র জীবনঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গে। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রতিদিনের মানুষের দিনযাপনের বহমানতা এবং অন্তরের আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনকাহিনী তিনি রচনা করেছেন। জীবনের বাস্তবতা হিসেবে গ্রামীণ সমাজের শোষক শ্রেণী ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ তাঁর গল্পসমূহে স্থান করে নেয়। তারই সঙ্গে সংযুক্ত হয় উপেক্ষিত নির্যাতিত নারীসমাজের নিষ্পেষিত হওয়ার চিত্রাবলি। ধর্ম নামক আদিম প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগ, ভালবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধের সুযোগ নিয়ে তথাকথিত মৌলভী, পীর, মোল্লাদের দুর্বৃত্ত পরায়ণতা ও লাম্পট্য সমাজের মানুষকে সচেতন করে এবং নতুন করে এ বিষয় নিয়ে ভাবার অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গা, কালোবাজারি, মজুতদারি, কৃত্রিম সংকট প্রভৃতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিক্ষুব্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ মানুষের ভোগান্তি ও জীবন সংগ্রামও সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বিভাগোত্তর কথাসহিত্যের জগতে একটি ব্যতিক্রমী নাম। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এক নতুন সাহিত্যধারার। সরদার জয়েনউদ্‌দীন এই সাহিত্যধারার অন্যতম পুরোধা। গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠার ফলে গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনালোককে করেছে শাণিত ও সমৃদ্ধ। পরবর্তী সময়ে জীবনের প্রয়োজনে তাঁকে তাঁর চিরপরিচিত, স্নেহলালিত গ্রামকে ছেড়ে আসতে হয়। চাকুরির সূত্রে তাঁকে অবস্থান করতে হয় কখনও কলকাতা কখনও ঢাকায়। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের প্রথম গল্পগ্রন্থ '*নয়ানঢুলী*'। প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকেই তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান অবলম্বন ছিল মূলত গ্রামীণ মানুষ ও তাদের বিচিত্র জীবন। সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, বিভিন্ন লোকাচার, বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাদের জীবন অতিবাহিত হয় তাদের নিজেদেরই মতো করে, সেসব মানুষের জীবনচিত্রনই সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পের মৌল অভিপ্রায়। বিশ শতকের পূর্ব-বাংলার গ্রাম জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র রূপায়নের ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে তিনি

তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, বিচিত্র স্মৃতি ও সমকালীন জীবনবাস্তবতাকে ব্যবহার করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল হৃদয়ের অন্ত:স্থলের ভালবাসা ও সহানুভূতি। আর এ কারণেই তাঁর গল্পগুলো হয়ে উঠেছে তৎকালীন গ্রাম বাংলার অকৃত্রিম দলিল এবং গাঁয়ের সহজ-সরল মানুষগুলোর অনবদ্য জীবনগাঁথা।

জমিদারদের শোষণ ও নির্যাতন লেখকের বিভিন্ন ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই খাজনা দেয়ার বিনিময়ে জমি চাষ ও ফসল উৎপাদন করে। অশিক্ষিত ও সরল কৃষকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার শ্রেণী কৃষককুলকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত গল্পসমসূহ হলো *নয়ানঢুলী* গ্রন্থের 'করালী', *খরস্রোত* গ্রন্থের 'উপকথা' ও 'আলীজান' প্রভৃতি।

'করালী' গল্পে অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের বিকৃত ও কদর্য রুচিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের তথাকথিত সমাজশক্তির ধারক, লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু জমিদারদের আচরণ ও কার্যকলাপে করালীর স্ত্রী জমিলার মত নারীরা দিশেহারা হয়। যুগ যুগ ধরে শক্তিহীনের উপর শক্তিমানের জুলুম চিত্রিত হয়। জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটে। 'উপকথা' গল্পে ইংরেজ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত অপপ্রথা বাস্তবায়নের দিকটি প্রকাশ পায় ও কৃষকশ্রেণীর সর্বস্বান্ত হওয়ার মর্মন্তুদ দিকটি রূপায়িত হয়েছে। তবে দুলাই পরগণাবাসী তাদের সমস্ত দু:স্বপ্নের রাত পেরিয়ে নতুন সূর্যের আলোয় জীবনকে উপভোগ করবে এমন প্রত্যয় ও আশাবাদের ভেতর দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে। 'আলীজান' গল্পের আলীজান ছিলেন জমিদারের তোষামোদকারী। আলীজান নিজের স্বার্থের জন্য যে কোনো অন্যায় কাজ জমিদারের নির্দেশে করে যায়। কিন্তু চল্লিশের কোটায় পৌছে রিক্সাচালক আলীজান অতীতের সমস্ত অন্যায় অনুধাবন করে। এক্ষেত্রে তার চেতনাগত পরিবর্তনের ফলে জমিদারতন্ত্রের অন্ত:সারশূন্যতা ও জমিতে কৃষকের অধিকার সম্পর্কে সে ভাবতে শুরু করে।

আমাদের এ সমাজে নারী বরাবরই অধিকারবঞ্চিত ও নিগৃহীত। সরদার জয়েনউদ্‌দীন নারীর এ অবস্থানকে তাঁর ছোটগল্পে তুলে এনেছেন। নারীর জীবনাচরণ ও তার ভাবনা,

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার অবস্থান ও মূল্যায়ন তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে *নয়ানঢুলী* গ্রন্থের 'ফুলজান' ও 'সবজানের সংসার', *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* গ্রন্থের 'ইজ্জত' ও 'গোলাপীর সংসার', *খরস্রোত* গ্রন্থের 'দ্রৌপদী' ও সামাজিক'।

গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে স্বামীহারা অসহায় এক নারীর জীবনের নির্মম ছবি 'ফুলজান' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। 'সবজানের সংসার' গল্পে গ্রামের প্রভাবশালী প্রেসিডেন্টের স্বেচ্ছাচারিতায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ভয়াবহতায় সাধারণষ মানুষের জীবনের হাহাকার এবং প্রাণ রক্ষার তাগিদে নারীর সম্ভ্রম বিসর্জনের বিষয় মূর্ত হয়েছে। 'ইজ্জত' গল্পে জনৈক নওয়াব জাদার নারীর প্রতি কামাতুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটলেও নারী কীভাবে তার সম্ভ্রম রক্ষার মাধ্যমে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে সে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। 'গোলাপীর সংসার' গল্পে গোলাপীর জীবনের বিপন্নতার পেছনেও মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাব, পাড়া-প্রতিবেশীর রটনা, স্বামীর অযৌক্তিক সংশয় ইত্যাদির সমন্বিত রূপ। গ্রামীণ সমাজের নৈতিক অধ:পতন ও স্খলনের দিকটি প্রকট হয় নারীর প্রতি পুরুষের ভোগবাদী দৃষ্টির মধ্য দিয়ে 'দ্রোপদী' গল্পে। 'সামাজিক' গল্পেও সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর গ্রামের বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির নিপীড়নের মূলেও রয়েছে নারীপ্রীতি ও ভোগ-আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু সরদার জয়েনউদ্‌দীন বিশ শতকের পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে তার সমস্ত আবেগ, স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করতে আগ্রহী। তাই তাঁর কিছু গল্পে নারী সমাজ ও পরিবারের অন্যায় শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আদেশ নিষেধ, সংস্কার ছিন্ন করতে আগ্রহী। তারা কখনো প্রতিবাদী হয়, কখনোও রক্ষণশীলতাকে চোখ রাঙিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। কখনো তাদের সম্পর্কে সমাজকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এ ধরনের গল্প হলো *বীরকণ্ঠীর বিয়ে* গ্রন্থের 'কোয়েলা' *অষ্টপ্রহর* গ্রন্থের 'মানুষের মত মেয়ে মানুষ' ও অগ্রন্থিত গল্পের 'মৃত্যু নয় অন্য কিছু'।

'কোয়েলা' গল্পটি 'গোলাপীর সংসার' গল্পের বর্ধিত রূপ। গাঁয়ের আর দশটা সাধারণ মেয়ের যে চিন্তা-ভাবনা ও চালচলন কোয়েলা তার থেকে আলাদা। ধর্ষিত হওয়ার পরও তার

মনে প্রশ্ন জেগেছে যে পুরুষদের কারণে নারীর এ অবমাননা, এ অপমান তাদেরকে এ সমাজ সম্মান দেয় কিভাবে। আর নতুন ভাবনায় আলোকিত কোয়েলা এ অধ:পতিত সমাজ ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে মাষ্টারের হাতে হাত রেখে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ায়। 'মানুষের মত মেয়ে মানুষ' গল্পের ব্যালমতীও নির্ভীক এক পরিপূর্ণ রমণী। সে তিন চার সন্তানের জননী হয়েও তার রূপের যাদুতে সকলকে মুগ্ধ করে, গ্রামের সমস্ত কুৎসা, রটনা, কুসংস্কারকে দুপায়ে মাড়িয়ে চলে। পাড়া গাঁয়ের নারী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের চিন্তার প্রকাশ। জীবনের চলার পথে সমস্ত অনধিকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার এক দুর্দমনীয় সাহস রয়েছে তার ভিতর যা বিশ শতকের বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। 'মৃত্যু নয় অন্য কিছু' গল্পে তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষ দ্বারা নিগৃহীত হয়ে গৃহপরিচালিকা ঝাঁপার মানসিকতারও রূপান্তর ঘটে। মৃত্যুকে ডেকে নেয়ার আগে ঝাঁপার মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয় যে, যাদের নোংরা মানসিকতার কারণে আজ সমাজে দুর্বল নারীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয় তাদের ভিতর যদি কোনো রকম অপরাধবোধ কাজ না করে তবে মৃত্যুতে কিসের প্রশান্তি। এ ভাবনাই ঝাঁপাকে বেঁচে থাকতে প্রত্যয়ী করে তোলে।

এছাড়া সরদার জয়েনউদ্‌দীনের আরো কিছু ছোটগল্পে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। 'কাজী মাষ্টার' গল্পে নারীকে শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাগ্রত হওয়ার জন্য শিক্ষায় আলোয় আলোকিত হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বসহকারে চিত্রিত হয়েছে। 'ভাবী' গল্পে সংসারে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীর অন্তরের সুতীব্র হাহাকার বর্ণনা করা হয়েছে। প্রেম-ভালবাসাহীন জীবনের সে অন্ত:সারশূন্যতা, স্বপ্নভঙ্গের যে অর্ন্তযন্ত্রণা এ সমস্ত কিছুকে সহ্য করতে না পেরে নারী কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করে তাই এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। গাঁয়ের বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার নির্মমতায় এক কিশোরীর স্বপ্নভঙ্গের বেদনার প্রকাশ পেয়েছে 'বীরকণ্ঠির বিয়ে' গল্পটিতে।

মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ধর্ম। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে তথাকথিত পীর, মৌলভী ও ইমামরা এই ধর্মকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে, যার শিকার হয় নারীরা। সাধারণ সহজ সরল মানুষের সরলতা ও বিশ্বাসকে ব্যবহার করে,

আল্লাহ, রাসূলের দোহাই দিয়ে তারা তারা নির্যাতন চালিয়ে যায় ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে মর্মান্তিক পরিণতি। 'তালাক' ও 'দুটো জ্বীন ও একটি প্রেম' গল্প দুটোতে এই বিষয়ের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

'বয়াতী' গল্পে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে মানুষকে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করাই সব ধর্মের মূলমন্ত্র, গল্পটিতে এবক্তব্যই প্রধান হিসেবে কাজ করেছে। আবার লেখকের কিছু কিছু গল্পে গ্রামের দরিদ্র-অসহায়, নি:স্ব মানুষের জীবন সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। এবং জীবনের প্রয়োজনে তারা রূঢ় ও কঠোর সত্যকে মেনে নিয়ে অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক গল্পসমূহ হলো *নয়ানঢুলী* গ্রন্থের 'নয়ানঢুলী', *বীরকণ্ঠির বিয়ে* গ্রন্থের 'উজান বাঁক' ও *খরস্রোত* গ্রন্থের 'কসম' ও 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা'।

তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দু:খদুর্দশার ছবি চিত্রিত হয়েছে 'নয়ানঢুলী' গল্পে। এ বৈষম্যপূর্ণ সমাজে নয়ানের মত মানুষেরা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই চৌর্যবৃত্তির মতো কাজে লিপ্ত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ঠিক একইরকমভাবে 'উজান বাঁক' গল্পে হতদরিদ্র, নি:স্ব জেলে নাগরবাঁশীর অনিশ্চিত জীবনের রূপ রূপায়িত হয়েছে। গ্রামবাসীর মিথ্যা সন্দেহের কারণে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে। 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা' গল্পটিতে ও হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির প্রেক্ষাপটে উনিশ বেয়াল্লিশের আকালের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক শ্রেণীর স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের কারণে যে দাঙ্গার রূপ ফুটে ওঠে তার ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষের জীবন। অতীতের সম্প্রীতির ও ঐক্যের বন্ধন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব, স্বত:ফূর্ততা ও উচ্ছ্বাস চিরদিনের মত হারিয়ে যায়।

অষ্টপ্রহর গ্রন্থের 'মামলা' গল্পটিতে দু:খ-কষ্ট-যন্ত্রণা-দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মহত্ত্ব, বিবেচনাবোধ ও স্বার্থহীন জীবনভাবনা রূপায়িত হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর সাথে মানুষ, তার জীবন ও জীবিকা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। এদেশের মানুষের জীবনে নদীর প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। নদীতীরবর্তী মানুষের জীবন ও জীবিকার বিচিত্রতা সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কিছু গল্পে উঠে এসেছে। যেমন *খরস্রোত* গ্রন্থের 'মাটি' ও *অষ্টপ্রহর* গ্রন্থের 'এক অঙ্গ দুটি মুখ'।

'মাটি' গল্পে পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যাওয়া চর খাঁপুরার অধিবাসীদের সবকিছু হারাবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ বেদনার পাশাপাশি নতুন চর জাগার সুখময় অনুভূতিও তাদের ছুঁয়ে যায়। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তারা ব্যর্থ হয়। এবং হতাশাজনিত অন্তর্যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়। গল্পটিতে মাটির প্রতি গাঁয়ের সাধারণ মানুষের যে গভীর মমতা ও ভালবাসা রয়েছে তা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাপটের কাছে এ ভালবাসাকেও হার মানতে হয়। 'এক অঙ্গ দুটি মুখ' গল্পেও আমরা পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনের দুঃখ ভরাক্রান্ত ইতিহাস দেখতে পাই। নদীতীরবর্তী এক অঞ্চলের মানুষ জীবিকার তাগিদে পদ্মার বেগবতী রূপকে সচল রাখতে আড়ম্বরপূর্ণ পূজা করে। আর অন্য অঞ্চলের মানুষ জীবনের প্রয়োজনেই চায় পদ্মা শান্ত হোক তাদের বাড়ি-ঘর পৈতৃক সম্পত্তি পদ্মার ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাক। পদ্মার এই অবিরাম ভাঙ্গা-গড়ার রূপ তীরবর্তী মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। আর এ প্রভাবের ফলেই মানুষ বহুকাল আগে থেকেই প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পন করেছে, প্রাকৃতিকে তুষ্ট রাখতে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের বিভিন্ন ছোটগল্প আলোচনায় আমরা দেখতে পাই তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীরা নিতান্ত সাধারণ, অকপট; কোন ছদ্মবেশ ও কৃত্রিমতা তাদের স্বভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, ব্যবহার, মনোভাবনা চিন্তা-চেতনার যে প্রকাশ ছোটগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিই তাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁর গল্পে যে মানুষটা স্বার্থলোলুপ ও খল, সে তার স্বভাবের ক্রুরতা, স্বার্থ-সর্বস্বতা ও কপটতাকে আশ্রয় করেই খল। সেখানে কোনো লুকোচুরি বা গোপনীয়তার চেষ্টা নেই। আবার যে নারী বা পুরুষ গ্রামীণ সমাজের শক্তিমত্ত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি দ্বারা নিপীড়িত ও অবহেলিত, তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামগ্রিক পরিবেশ, তার পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, উক্ত চরিত্রের মনোভাবনা ও আচরণ

প্রভৃতির উপস্থাপন করেছেন। এর ফলে সেসব নর-নারী পাঠকের কাছে রীতিমতো জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং এ কারণেই সমালোচক আজহার ইসলাম তাদেরকে ‘আগাগোড়াই প্রাকৃতিক’ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যাদের স্বভাবে রয়েছে মানব সভ্যতার আদিম সহজ ও অনাড়ম্বর রূপ।

গ্রামীণ মানুষের জীবনের সাথে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের যে অন্তরের টান প্রধানত তার কারণেই তিনি তাদের জীবন কাহিনীকে এত প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। গ্রামের এই মানুষগুলোর সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি, বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কারের সংমিশ্রণে যে জীবন গড়ে উঠেছে এর ফলেই সরদার জয়েনউদ্‌দীনের গল্পের মানুষগুলো পাঠকের মানসলোকে আবহমান বাংলার জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এখানেই তিনি অনন্যসাধারণ।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. সরদার জয়েনউদ্‌দীন রচনাপঞ্জি

১. গল্পগ্রন্থ
সরদার জয়েনউদ্‌দীন গল্পসমগ্র, ২০০৬, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স

২. অগ্রন্থিতগল্প
সরদার জয়েনউদ্‌দীন গল্পসমগ্র, ২০০৬, ঢাকা মওলা ব্রাদার্স

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অমলেন্দু দে ঃ *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, ১৯৭২, কোলকাতা, রত্না প্রকাশন

অজয় রায় ঃ *বাঙলা ও বাঙালী*, ১৯৭৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (তৃতীয় খণ্ড), ১৯৯৫, কোলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি

আজহার ইসলাম ঃ *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, ১৯৯৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

আহমদ কবির ঃ *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের* (জীবনী গ্রন্থমালা), ১৯৮৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

আবু ইসহাক ঃ *মহাপতঙ্গ*, ১৯৬৩, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ ঃ *শ্রেষ্ঠগল্প*, ১৯৮৭, ঢাকা

খালেদা হালুম ঃ *বাংলাদেশের ছোটগল্প ১৯৪৭-১৯৭০*, ১৯৯৭, ঢাকা, এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন

গোলাম মুরশিদ ঃ *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা

চঞ্চল কুমার বোস ঃ *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, ২০০৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

নাজমা জেসমিন চৌধুরী ঃ *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, ১৯৯১, ঢাকা, মুক্তধারা

ভবাণী সেন ঃ *ভাঙনের মুখে বাংলা*, ১৯৪৫, কোলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

রফিকউল্লাহ খান ঃ *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

সাইদ-উর-রহমান ঃ *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, ২০০১, ঢাকা, অনন্যা

শাহীদা আখতার ঃ *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, ১৯৯২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

শওকত ওসমান ঃ *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, ১৩৫৮ বাংলা, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই
সৈদয় আলী আহসান ঃ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), ১৯৭৯, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং

ফজলুল হক সৈকত ঃ *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*, ২০০৮, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

বিশ্বজিৎ ঘোষ ঃ *বাংলা সাহিত্যপাঠ*, ১৯৭২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

গ. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ *বিবেচনা ও অবিবেচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৪০৬ বাংলা, ঢাকা, জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল

চৌধুরী মোঃ তাশরিক ই হাবিবঃ *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, সপ্তবিংশ খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৯

আতোয়ার রহমান ঃ *পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস*, সরদার ফজলুল করিম, আমাদের সাহিত্য, ১৩৭৬ বাংলা, বাংলা একাডেমী

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন ঃ *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাস সমাজ বাস্তবতা*, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আষাঢ় ১৩৯৫

যতীন সরকার ঃ *যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক ও বাংলাদেশের উপন্যাস*, উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৬

ঘ. সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ

Dr. K. C. Chowdhury ঃ *Role of Religions in Indian politics* (1900-1925) 1978, Delhi